নায়ক ও লেখক

শ্রীনবেন্দু ঘোষ

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

'প্রভাতী' ও 'বেহার হেরাল্ড'
পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, করকমলেষু

সাহিত্যিকের তুলনায় সাহিত্যরসিকের সংখ্যা আমাদের দেশে বড় কম। সত্যিকারের সাহিত্য রসিকেরাই সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন, তাই সাহিত্যিকদের কাছে তাঁরা চিরদিনই শ্রদ্ধার পাত্র। মণিদা যে সেই শ্রেণীর সাহিত্যরসিক এ বিশ্বাস আমার আছে বলেই আমার এই প্রথম গ্রন্থ তাঁকেই উৎসর্গ করিলাম।

—লেখক—

পাটনা,
শ্রাবণ, ১৩৫০

নায়ক ও লেখক

বর্ত্তমানযুগের শ্রেষ্ঠ লেখক

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত

প্রবন্ধ

জীয়ন কাঠি	...	১।০
দেশ কাল পাত্র	...	১।০
তারুণ্য	..	১।০
আমরা	...	১।০
বিনুর বই	...	২॥০
ইশারা	..	১।০
জীবন-শিল্পী	...	১।০

ছোট গল্প

মন-পবন	...	২৲
প্রকৃতির পরিহাস	...	২৲

উপন্যাস

সত্যাসত্য সিরিজের ৬ খানা

যার যেথা দেশ	...	৪॥০
অজ্ঞাত বাস	..	৪॥০
কলঙ্ক-বতী	...	৪৲
দুঃখ-মোচন	. .	৪॥০
মর্ত্তের স্বর্গ	.	৪॥০
অপসরণ	...	৫৲

ও

আগুন নিয়ে খেলা	...	৩৲
পুতুল নিয়ে খেলা	...	২। ·

কবিতা

নূতনারাধা	.	২।০
কামনা পঞ্চবিংশতি	...	।০

বনফুল ডাঃ বলাইচাঁদ মুখার্জ্জি প্রণীত

ডানা (১ম)	...	৩॥০
ডানা (২য়)	...	৩॥০
শ্রীমধুসূদন	...	৩৲
বিদ্যাসাগর	...	৩৲
নির্ম্মোক	...	৪॥
মধ্যবিত্ত (নাটক)	...	১৲
চতুর্দ্দশী (কবিতা)	...	॥৵০
নবদিগন্ত উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)	...	

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

স্ত্রী ভাগ্যে	...	৩॥০
কণ্ঠাভরণ	...	২৲
অভয়ের বিয়ে	...	৩৲
তারপর	...	৪৲
রবীন মাষ্টার	...	৩॥০
মর্ম্ম ও কর্ম্ম	...	৩৲
তরুণী ভার্য্যা	...	৩॥০
অগ্নি-সংস্কার	..	২॥০
টিকিবনামটাক	...	৩॥০
বেতারে বর	...	৩॥০

নবেন্দু ঘোষ প্রণীত

ফিয়ার্স লেন	...	২।০
বসন্তবাহার	...	৩৲
নায়ক ও লেখক	...	২॥০

ডি, এম, লাইব্রেরী,
৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

নায়ক ও লেখক

ভাবিতেছি।

বাহিরের গাছ-পালার পাতায় পাতায় অন্ধকার বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাকও আরম্ভ হইয়াছে। সামনের বড় অট্টালিকার রান্নাঘর হইতে কয়লার ধোঁয়া নির্গত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারকে ভারী কবিতেছে। ভাবিতেছি।

আমার ক্ষুদ্র ও অপরিসর কক্ষে সাময়িক পত্রিকা আর পুস্তকাদির স্তূপ বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। এককোণে ভাঙ্গা টেবিলটার সম্মুখে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি। কাণের পাশে মশকের দল সোৎসাহে পূরবী রাগিণী গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেন ভাবিতেছি? গল্প লিখিতে হইবে। কিন্তু গল্পের কোনও কথা মাথায় মোটেই ঘুরিতেছে না। বাহিরের অন্ধকারের মতই কালো কালো অজ্ঞাত কতকগুলি চিন্তা মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হয়ত অকস্মাৎ কোনও

এক মুহূর্ত্তে এই সকল কালো কালো ভাবনার মেঘরাশিকে বিদীর্ণ করিয়া আমার গল্পের প্লট আসিবে। হয়ত।

একটা বিড়ি ধরাইলাম। মলিন কাচযুক্ত ভাঙ্গা হ্যারিকেনটার স্তিমিত আলোকে স্বল্পালোকিত কক্ষে বিড়ির ধোঁয়া একটা অবাস্তব রহস্যের কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। পিছনের বিবর্ণ দেওয়ালে আমার ছায়াও আমারই মত ভাবিতেছে।

কেন এত ভাবি? উত্তর নাই। কেন অর্থহীন এলোমেলো চিন্তার মেঘ মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়ায়? কেন? সেদিন গৌরীও (আমার একটি বোন, সহোদরা নয়, কিন্তু সহোদরারও অধিক) আমায় প্রশ্ন করিয়াছিল, "আচ্ছা দাদা, কেন এত লেখ?"

গৌরীর প্রশ্ন শুনিয়া একটু চমকাইয়া গিয়াছিলাম। কেন লিখি—এ প্রশ্ন নিজেকেও কোনদিন করি নাই।

হাসিয়া বলিয়াছিলাম—"এমনি"—

গৌরী মাথা নাড়িয়াছিল, আমার উত্তরটা তাহার নিকট ফাঁকি বলিয়া বোধ হইয়াছিল, দুইটি উজ্জ্বল ও ডাগর ডাগর চক্ষুর তারাতে অনুযোগের দীপ্তি প্রকাশ করিয়া সে আবার বলিয়াছিল—"না, সত্যি; কি দরকার তোমার লেখার?"

একটু ভাবিয়া আরও কতকগুলি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাহাকে উত্তর দিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, "আচ্ছা বলত গৌরী, মানুষ হাসে কেন, কাঁদে কেন? ফুল ফোটে কেন? বাতাস বয় কেন?"

গৌরী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া আমাকে পাগল ভাবিয়া বলিয়াছিল—"কি জানি। আমি ওসব জানি না—"

উত্তরে আর কিছু না বলিতে পারায় নিঃশব্দে শুধু হাসিয়াছিলাম। সেদিনের সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন আবার হাসি পাইতেছে।

গৌরীকে না হয় বাজে কথা বলিয়া ভুলাইয়াছি, কিন্তু গৌরী যে প্রশ্নের বীজ আমার মনে রোপণ করিয়া গিয়াছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে আজ আমি নিজেকে কি বলিব ?

তাই ত, কেন লিখি ? এই পৃথিবীর পরম পরমার্থ অর্থলাভ ত' লেখার বদলে হয় না, তবুও কেন লিখি ? সহজ ও চলনসই উত্তর ত' অনেক আছে, কিন্তু সে ত' নিতান্তই সহজ ও চলনসই। আসল উত্তর কবে পাইব ?

না—কি ভাবিতেছি আমি—

সময় কাটিতেছে। সময়ই জীবন, সময়ই ইতিহাস। কত সময় কাটিয়াছে, কত জীবন। কত ইতিহাস রচিত হইয়াছে। মানুষ কতটা অগ্রসর হইয়াছে।

"ওরে —"

মা।

"কি ?"

"কিছু পয়সা দে।"

"কেন ?"

"ডাল আনিয়ে নিই।"

পকেট হাতড়াইলাম। আনা চারেক আছে। বিড়ির জন্য এক আনা রাখিয়া তিন আনা দিলাম। আজ মাসের কতই ?

মা চলিয়া গেলেন। স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে যে কল্পলোকের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা মায়ের দুইটি কথায় যেন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। না, লুপ্ত হইলে চলিবে না।

দরজা ভেজাইয়া আবার বিড়ি ধরাইলাম। না, আর অর্থহীন চিন্তা নয়। সময় কাটিতেছে। আঃ, বাহিরে কি গাঢ়, কি সূচীভেদ্য অন্ধকার !

কি গল্প লিখিব ? যাহাই লিখি না কেন, আর পুরাতন দৃষ্টিতে নয়, আর দুর্ব্বল নরনারীকে লইয়া নয়। শুধুই জীবনের প্রতিচ্ছবি লইয়া যে সাহিত্য রচনা করিয়াছি সে সাহিত্যে দুঃখই শুধু বাড়িয়াছে, কমে নাই, আনন্দ পাই নাই। না, নূতন জীবনের ছবি এবার আঁকিব—যে জীবন পরাজয় মানে না, নিরাশার গান গাহে না—

বাহিরের অন্ধকারে বর্ষার নদীর মত কত অদৃশ্য আবর্ত্ত আবর্ত্তিত হইতেছে।

সামনের বাড়ীতে কে যেন গান গাহিতেছে। কি গান বুঝি না, কেবল সুর শুনি। ক্লান্ত যান্ত্রিক সুর।

আকাশে বেশী নক্ষত্র নাই।

কেমনভাবে গল্প আরম্ভ করিব ? আমারি মত দরিদ্র গৃহে আমার নূতন নায়কের জীবন আরম্ভ হইবে—তাহাকে সাধারণ গল্পের নায়কের মত দুর্ব্বল করিব না, তাহাকে দুর্দ্ধর্ষ ও কঠোর-প্রাণ মানুষ করিয়া গড়িব। আধুনিক মানুষের সব কিছু আছে কেবল মেরুদণ্ড নাই, কিন্তু আমার নায়কের সেই মেরুদণ্ড থাকিবে। নেহাৎ স্বার্থপরের মত কেবল নেওয়া-দেওয়ার যে জগৎ,—যে স্বার্থের জগৎ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি, আমার নায়ক সেই জগতের মূলে কুঠারাঘাত হানিবে—যে আদর্শ ও স্বপ্ন—

"কি ভাবছ ?"

হ্যাঁ, স্বপ্ন বটে ! দেবী আসিয়াছে। বীণার ঝঙ্কারের মত আমার সমস্ত হৃদয় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

"বোস দেবী।"—সহাস্যমুখে বলিলাম।

দেবী আমার কক্ষের ভিতর ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, ঘরের ভিতরকার অবরুদ্ধ বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ পাইয়া ও সাদা কাগজ দেখিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া একটি চেয়ারে বসিল এবং কোনও কথা না বলিয়া

টেবিলের উপর হইতে একটি পত্রিকা তুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

আমার কক্ষের আবহাওয়া মুহূর্ত্তে মদির ও অলস হইয়া উঠিল। রহস্যের মেঘে তাহা ভরাট। দেবী। আমার কক্ষ যেন দেবীর আগমনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভাঙ্গা হ্যারিকেনের শিখাটা যেন বিদ্যুতের মত ভাস্বর। ভালবাসি, এই নারীকে আমি ভালবাসি।

দেবী স্থিরভাবে বসিয়া কি একটা ছবি যেন দেখিতেছে। তাহার সুঠাম দেহরেখাকে পল্লবিত করিয়া একটি রক্তের মত লাল সাড়ী, সুগোল হাত দুইটিতে গুটিকতক সোনার চুড়ী, কাণে দুইটি দুল। আমার দেহের রেখায় রেখায়, প্রতি রোমকূপে, অন্তরের সূক্ষ্ম ও অদেহী চেতনার জগতে ঝড় উঠিয়াছে। দেবীর আঙ্গুলগুলি যেন একটি পদ্ম (আমার উপমা হয়ত ভুল, কিন্তু আমি কি করিব, উপায় নাই, আমার কল্পনাকে আমি স্থির রাখিতে পারিতেছি না)—সেগুলি স্থির হইয়া আছে, যেন বাতাস না থাকায় নিস্তরঙ্গ দীঘির বুকে পদ্মগুলি স্বপ্ন দেখিতেছে। দেবী। কি ভাবিতেছে সে? আমার নূতন গল্প। গল্প নয় নায়ক। দেবী কেন কথা বলে না?

"তুমি কেন কথা বলছ না দেবী?" প্রশ্ন করিলাম।

দেবী মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। তাহার মুখ প্রশান্ত, ললাটের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটি কালো টিপ, চোখের নীচে অতি সূক্ষ্ম কাজলের রেখা, অর্দ্ধ-নিমীলিত নিবিড় পক্ষরাজী দ্বারা আবৃত চক্ষু দুইটি যেন গভীর স্বপ্নে মগ্ন, ঘোর কালো তারা দুইটির মধ্যে বাহিরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত অতলস্পর্শী রহস্যের ইঙ্গিত। ভালবাসি, এই নারীকে আমি ভালবাসি।

"কি কথা বলব?" দেবী হাসিয়া উত্তর দিল। সারা কক্ষে যেন মৃদু সঙ্গীতের তান গুঞ্জরিয়া উঠিল।

"তোমার যা ইচ্ছে—"

দেবী হাসিল। পাৎলা ঠোঁট দুইটির পাশে হাসির রেখা জোয়ারের জলরেখার মত বাড়িতেছে কমিতেছে।

"তুমি বুঝি এখন লিখবে?"

"হ্যাঁ—"

"কি লিখবে?"

"গল্প—"

"কি নিয়ে লিখবে—প্রেম, আত্মহত্যা, ব্যর্থতা?"

"যা বলছ তা হয়ত থাকবে, আমাদের জীবন, যে জীবনকে এতদিন চিত্রিত করেছি—সেই জীবনই হবে গল্পেরও জীবন কিন্তু নায়ক হবে নতুন মানুষ—"

"বটে!"

"হ্যাঁ—"

"ভাল, লিখলে একদিন শুনব—"

"শুনবে তুমি!" অধীর আগ্রহে উৎসুক হইয়া উঠিলাম। দেবী কোনও দিনই আমার গল্প শুনিতে চায় নাই।

"হ্যাঁ—"

দেবী চুপ করিল।

আমি কথা খুজিয়া পাইতেছি না। কি কথা বলব? নূতন গল্প। নায়ক। আমার নায়ককে আমি দেখিতে পাইতেছি। সে বন্ধনবিহীন মুক্ত, স্বাধীন। কি কথা বলিব? আমার দুই দিকে দুই জগৎ। দেবী আর নায়ক। দুই-ই আমার কাছে সত্য। দুই-ই পরম প্রয়োজনীয়। বাস্তব ও কল্পনা। কল্পনার অন্ধকার কক্ষ হইতে বিদ্যুতের মত আমার নায়ক বাহির হইয়া আসিতেছে। দেবী সম্মুখে বসিয়া। কক্ষের ভিতর নিস্তব্ধতা

ঘনীভূত হইতেছে। শিল্পীর জীবনে কত ব্যর্থতা! আমার নায়ক সংসারকে ত্যাগ করিয়া চলিতেছে। বৈরাগ্য অনুপ্রেরিত হইয়া নয়, কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া। দেবীকে কবে বলিব যে আমি তাহাকে ভালবাসি? আজই—এই মুহূর্ত্তে?—কিন্তু না, কেন এই পতঙ্গের আকুতি? দেবী ধনীর কন্যা—সে অন্য বর্ণের—আর আমাদের দেশের সমাজের বিধান অমোঘ, মানুষের আভিজাত্য গৌরব প্রবল। তবুও—বলি—। আমার নায়কের ললাট প্রশস্ত ও উজ্জ্বল, তাহার দৃষ্টি প্রখর ও উন্নত। এইত' সময়। কক্ষ নির্জ্জন শুধু আমি আর দেবী। দেবী আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমার বুকে কামনার ফুল পূর্ণ প্রস্ফুটিত, প্রেমের ভাষা প্রকাশোন্মুখ—এই ত' সময় বলি—

"দেবী—"

"এঁ্যা—"

দেবীর যেন চমক ভাঙ্গিল। কি যেন সে ভাবিতেছিল। সে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল।

আর কথা খুঁজিয়া পাই না। ভাষা মূক হইয়া গেল।

"কি বলছ?" দেবী জিজ্ঞাসা করিল।

কেমন করিয়া বলিব বুঝিতে পারি না। বুক জ্বলিয়া যাইতেছে অথচ জিহ্বা সরিতেছে না। আমার নায়ক জনকোলাহল মুখরিত একটি ষ্টেশনে দৃপ্তপদক্ষেপে চলিতেছে।

"কি হঠাৎ বুঝি ভাবের বন্যায় ডুবে গেছ?" দেবী রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিল।

না, কথা বলিতেই হইবে।

"তোমায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে—" বহুবার একথা বলিয়াছি।

"তাই নাকি, তা এই কথা বলতে এত সময় লাগল?"

"সত্যি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমায় এই লাল সাড়ীটায়—যেন তুমি মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা—"

"ও বাবা—এত বড় উপমা হজম করতে পারবো না—" দেবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর্ত্ত কণ্ঠে বলিলাম, "চললে ?"

"হ্যাঁ যাই, তোমার বোনের খোঁজে এসেছি, তার সঙ্গে দুটো কথা না বলে খালি তোমার উচ্ছ্বাস শুনলে ভাল দেখায় না।"

একবার আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পিছন হইতে মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "দেবী, তুমি একটি প্রহেলিকা।"

উত্তরে দেবীর লঘু হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিয়া আমার সমস্ত চেতনার দুয়ারে কষাঘাত হানিল।

আমার কক্ষের আলো ম্লান। বলিতে পারিলাম না, আসল কথাই অকথিত রহিয়া গেল। এতক্ষন ধরিয়া রহস্যের যে অদৃশ্য লুতাতন্তু, যে উত্তপ্ত আবহাওয়া সারাকক্ষে রচিত হইতেছিল, তাহা যেন লোপ পাইতেছে আমার নায়ক জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছে। কোথায় সে ? অন্ধকার মত একটা জগৎ এখন অদৃশ্য হইয়া গেল। অপর জগৎকে এবার সত্য করি, জীবন্ত করি। বলিতে পারিলাম না। জানাইতে পারিলাম না। বিরাট পর্ব্বতের গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত তৃণরাশির মত আমার প্রেম অপ্রকাশিত রহিয়া গেল। আমার নায়ক কোথায় ? ভুলিতে হইবে। ক্ষনিক বিস্মৃতির যবনিকাতলে এখন আমার জীবন, আমার দারিদ্র, আমার দুঃখ, আমার প্রেম, আমার ব্যর্থতা সব কিছু চাপা পড়ুক। আমার নায়ক কোথায় ?

বিড়ি ধরাইলাম।

জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইলাম। অন্ধকার। ছায়ামুর্ত্তির মত গাছপালাগুলি। কালো আকাশে কম্পিত নক্ষত্রদল।

সময় কাটে ; সময় যেন একটা বৃদ্ধ পাখী। সে উড়িতেছে যুগযুগান্তর ধরিয়া।

আমার কক্ষ লুপ্ত হইয়া গেল। আমি যেন চলিতেছি। কোথায়? আমার নায়ক কোথায়?

সময় কাটে। বৃদ্ধ পাখীর মতো—

ট্রেণ চলিতেছে। পাইয়াছি। খুঁজিয়া পাইয়াছি। থার্ড ক্লাসের একটি কামরায়, এক কোণে বসিয়া পশ্চাতের অপসৃয়মান অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে সে চাহিয়া আছে।

তাহার পার্শ্বে বসিলাম।

সে আমার দিকে চাহিল।

বলিলাম, আমায় তুমি চেন?"

সে মাথা নাড়িল, "না, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার কি যেন একটা গভীর সম্বন্ধ আছে—কে আপনি?"

"তোমার স্রষ্টা।"

সে বলিল, "নমস্কার, আপনিই নবেন্দু ঘোষ?"

"হ্যাঁ—"

সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। চুপ করিল। ট্রেণ চলিতেছে।

কামরার আলো আমার নায়কের মুখের অর্দ্ধাংশ আলোকিত করিয়াছে। তাহার বর্ণ দগ্ধ গৌরবর্ণ, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের মত তিনটি গভীর রেখা উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ আর কুঞ্চিত কেশরাশি।

"নায়ক—" ডাকলাম।

"কি বলছেন?"

"তুমি আমার স্বপ্ন, সত্যি বলছি, তুমি আমার স্বপ্ন। বহুদিন

ধরে তোমায় আমি কল্পনা করেছি, তুমি আমার স্বপ্নকে সার্থক করো।"

নায়কের ভ্রূকুঞ্চিত হইল।

"আপনার কোন স্বপ্নকে আমি সার্থক করব ?"

"ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আমার মত শিল্পীর স্বপ্ন।"

"কি সেটা ?"

"সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। আজকালকার সাধারণ নায়কদের মত তোমার প্রেম করলে চলবে না—"

"ওঃ বাবা—এ যে বিরাট কাজ মশায়, অতি মানব না হলে এ সম্ভবপর হবে না।"

ট্রেণ চলিতেছে। দুরন্তবেগে।

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলাম—"তোমায় অতিমানব হতে হবে, আমি তোমায় তা করব।"

নায়ক হাসিল।

"তুমি হাসছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"জানিনা।"

চুপ করিলাম।

"নবেন্দুবাবু—" নায়ক ডাকিল।

"এ্যাঁ ?"

"চেষ্টা করব—আপনার স্বপ্নকে সার্থক করতে।"

দুই হস্তে নায়কের স্কন্ধে (প্রস্তর সদৃশ দৃঢ় স্কন্ধ) ঝাঁকুনী দিলাম,.. পারবে ? ভাল, আমায় বাঁচালে—বাঁচালে—"

"কিন্তু শুনুন—" সে বলিল।

"কি ?"

"অসাধারণ হতে যখন আমায় বলছেন তখন সাধারণ নায়কদের স্রষ্টার মত আমায় অঙ্গুলী হেলনে চালিত করতে পারবেন না। আমি আপনার কল্পনার জীব বটে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় মশাই বেশী হাত দেবেন না।"

রাজী হইলাম। ট্রেণ চলিতেছে। ট্রেণের চাকা আর রেললাইন। কামরার ভিতর আলো জ্বলিতেছে, আলোর চতুর্দ্দিকে পতঙ্গের দল। দীপ্তিহীন নেত্রসম্পন্ন যাত্রীদের ভাঙ্গা গালে আলো পড়িয়াছে। এযুগের মানুষ। ব্যর্থ যুগের মানুষ।

"নায়ক—"

"বুঝেছি মশায়—নিশ্চিন্ত থাকুন—" হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, বিশাল প্রস্তর বক্ষটিকে ফুলাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"হবে—আপনার স্বপ্নকে সার্থক করব—এ যুগের ব্যর্থতার ক্ষোভ ভবিষ্যতে মিটে যাবে—"

কামরার লোকেরা সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল। ট্রেণ চলিতেছে। উন্মাদের মত মত্ত যান্ত্রিক সঙ্গীত গাহিয়া দুর্নিবার বেগে চলিতেছে। আমার নায়কের ওষ্ঠদ্বয় উত্তেজনায় কাঁপিতেছে। আমার নায়ক ভবিষ্যতের মানুষ। বহু গল্প লিখিয়াছি, বহু মানুষের সৃষ্টি করিয়াছি—তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাসের ঘরের সংসার, বুদ্বুদের অনুভূতি ও দুর্ব্বল জীবনের চিত্র আঁকিয়াছি। ভুল করিয়াছি। জীবনের চেয়ে বড় কিছুই নাই—মানুষের চেয়ে সত্য কিছুই নয়। আমার নায়ক বর্ত্তমানে যুগের অক্ষম মানুষদের মধ্য হইতে ধূমকেতুর মত একদিন দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে এবং তাহাদের অন্ধকার জীবনকে আলোকের সাগর-সঙ্গমে লইয়া যাইবে। সে কবে ? কিন্তু পারিব কি ? আমার নায়কের জীবনকে ঠিক পথে

পরিচালিত করিতে পারিব কি ? হয়ত পারিব না। তবুও চেষ্টা করিব— নিরাশ হইলেও আমার আত্মার নিকট ত আমি বলিতে পারিব যে চেষ্টার ত্রুটি আমি করি নাই।

"শুনছেন—" নায়ক ডাকিল।

"কি বলছ ?

"একটা নাম এখন আমার ঠিক হল না যে—"

"ও ঃ—ঠিক কি নাম চাও ?"

"যা হোক একটা কিছু দিন না—যতীন, রামপদ, বটকৃষ্ণ"—সে হাসিল।

মাথা নাড়িলাম। বড় পান্‌সে ; মেরুদণ্ডহীন মানুষদের নাম ওগুলি।

বলিলাম—"না, ওসব নয়, তোমার নাম হল ভাস্কর।"

সে মৃদু হাসিল।

ট্রেণ চলিতেছে। চলিতেছে। লৌহচক্র আর বাষ্পরাশি আর রেললাইন। চলিতেছে।

"এবার আমায় কি করতে হবে ?" ভাস্কর প্রশ্ন করিল।

হাসিলাম, "তোমার নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় তুমি হস্তক্ষেপ পছন্দ কর না বল্লে—আমিও তোমায় কিছু বলব না। তুমি স্বাধীন—নিজের ইচ্ছামত তুমি চল—আমি শুধু তোমার জীবনের ঘটনার লেখক হব—মাঝে মাঝে যদি তোমার আচরণ বা গতি আমার পছন্দ না হয় তবে বন্ধুভাবে দুটো একটা উপদেশ দেব বা আদেশ করব।"

সে তাহার চওড়া কব্জিওয়ালা একটি হাত বাড়াইয়া আমার দক্ষিণ হাতে কঠোর চাপ দিয়া বলিল—"তথাস্তু—"

প্রশ্ন করিলাম, "এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

ভাস্কর হাসিল—"যেখানে এই গাডী থামবে—"

"ওঃ—কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছ ?"

"অত উকিলের মত জেরা করবেন না মশাই—যাচ্ছি মহানগরীতে—পশ্চাতের অতীত আমার আপনি অন্ধকার করে সৃষ্টি করেছেন—সেখানে আপনাদের বর্ত্তমান জগতের শতকরা নব্বই জনের মত আমার গৃহে মা আছে, ভাই বোন আছে, অসংখ্য চাহিদা আছে—নেই শুধু টাকা। এখন বর্ত্তমানে একটি উদ্দেশ্য—ঐ টাকার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি, কিন্তু আসলে সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসলটির কথা এখন বলব না, সে ধীরে ধীরে জানবেন।"

নিষ্পলক নেত্রে আমি আমার নায়কের দিকে চাহিয়া রহিলাম। স্রষ্টার মুগ্ধ বিস্ময়।

ট্রেণ চলিতেছে। গতিই জীবন। দুর্ণিবার গতিতে সমস্ত কিছু দলিয়া অগ্রসর হওয়াই ত পৌরুষ।

ভাস্কর চুপ করিয়াছে। ভাবিতেছে। লৌহচক্র আর লোহার লাইন। কামরার উজ্জ্বল আলো আর মুগ্ধ পতঙ্গের সঙ্গীত। এ যুগের ব্যর্থ মানুষদের ভাঙ্গা গাল আর তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষু।

ট্রেণ চলিতেছে। বাহিরের পৃথিবীতে অন্ধকার।

সময় কাটে।

ট্রেণের গতি মন্দ হইল। বাহিরে আলো আর মানুষ আর অট্টালিকা।

ট্রেণ থামিল। মহানগরীর ষ্টেশনে বিরাট কোলাহল। আলো আর জনতা।

"চল্লাম"—একটি হাত শূন্যে আন্দোলিত করিয়া ভাস্কর কামরা হইতে নামিল, অপর হাতে একটি কাপড়ের পুটুলী মাত্র, আর কিছুই নাই।

"চল্লে ?"

"হ্যাঁ—এখনকার মত বিদায়—অবশ্য সাময়িকভাবে—তাছাড়া

আপনাকে বিদায় বললেও আপনার অসীম রাজ্য থেকে ত' বিদায় নিতে পারব না।" সে হাসিল। প্রাণবন্ত হাসি।

"এসো তাহলে—"

সে বড় বড় পা ফেলিয়া জনতায় মিশিয়া গেল। আমার নায়ক ভাস্কর। তাহার জীবন আরম্ভ হইল। তাহার জীবন ভবিষ্যৎ মানুষের জীবন। বলিষ্ঠ জীবন।

"অত লিখো না—পাগল হয়ে যাবে।"

কল্পনার জগৎ মূহূর্ত্তে বায়বীয় পদার্থের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। সমস্ত শরীর এই কথাগুলিতে রোমঞ্চিত ও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, কক্ষে যেন সহস্র মধুলুব্ধ ভ্রমরের সঙ্গীত ধ্বনিত হইল। কে?

পিছন ফিরিয়া চাহিলাম। দেবী। দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেআমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার দুই চোখে দুই আধঘুমন্ত চাঁদ।

বলিলাম —"হব না—হয়ে গেছি দেবী।"

সে সশব্দে হাসিল। সে শব্দ উচ্চ নয়, বীণার ঝঙ্কারের শেষ রেশটুকুর মত মোলায়েম ও মধুর।

আবার তাহাকে দেখি। যতই দেখি ততই মনে হয় যেন নূতন দেখিতেছি। যখনই দেখি তখনই মনে হয় আমি বাঁচিয়া আছি।

দেবী। তাহার ঠোঁট দুইটিতে উদিত সূর্য্যের রক্তালোকের নিবিড় প্রলেপ, কুন্দশুভ্র মরাল গ্রীবার উপরে সুপ্ত কালনাগিনীর মত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশির কবরী, শিবের ডমরুর মত অতি ক্ষীণ কটিদেশকে ঘিরিয়া লাল সাড়ীর বহ্নিশিখা। দেবী।

"অত চুপ করে কি ভাবছ?" সে প্রশ্ন করিল।

"ভাবছি না—দেখছি"

"কি ?"

"তোমায় ?"

"কেন ?"

"তুমি সুন্দর।"

হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া গেল, মাথা ঈষৎ নাড়িয়া বলিল, "তোমার কথা বড় অদ্ভুত--সত্যি, তুমি পাগল হয়েই গেছ—"

"হয়ত তাই—কিন্তু কথাগুলো মিথ্যা নয়--তুমি সত্যি সুন্দর দেবী—"

সে কথা চাপা দিল, একটু লাল্‌চে আভা হয়ত তাহার গালের উপর দেখাও গেল, আমার ঘরের ম্লান আলোতে তাহা ঠিক বোঝা যায় না। সে বলিল, "এতক্ষণ বসে কি লিখলে ?"

মনে পড়িল। ভাস্কর।

"আমার গল্প সুরু হয়েছে দেবী—নায়ক গেছে মহানগরীতে —"

সে কৌতুকের সুরে বলিল—"ও ঃ, এবার বুঝি মহানগরীর পথে এ্যাকসিডেণ্ট —তারপর নায়িকার আবির্ভাব--না ?"

"তা নয়—আমার নায়ক আমার হাতে নয়—সে কি করবে আমি জানি না।"

"ওঃ বাবা—এযে সত্যি নতুন ব্যাপার।"

ভাল লাগে না এসব কথা। দেবী কি কিছুই বুঝিতে পারে না ? দেবী একটি প্রহেলিকা। অল্প কথা, অল্প হাসি, সতর্ক চাহনি—দেবী নিজেকে প্রকাশ করে না। নিজের রহস্যে সে নিজেই মগ্ন। সে যেন একটি দুর্গ। তাহার মনের অদৃশ্য লৌহ প্রাচীরে যত আঘাতই দিই না কেন যত আক্রমণই করি না কেন, সব প্রতিহত, নিস্ফল হইয়া যায়।

"দেবী—তুমি কি কিছুই বোঝ না ?"

"বুঝি বইকি—বয়স আমার কত তা তুমি জান?" দেবী কথার মোড় ঘুরাইতেছে—আমার মনের কথা সে আমার প্রকাশ করিতে দিবে না কিন্তু আগুনকে কত চাপিয়া রাখি?

"জানি না—জানতে চাই-ও না—"

"শোনই না—আমার বয়স উনিশ বছর—আমার—"

"আঃ দেবী—"

দেবী থামিল; ক্ষণেকের জন্য স্থির দৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিজালার ইন্ধন যোগাইয়া পরে হাসিয়া বলিল, "তুমি সাহিত্যিক তাই তোমার কোন কথাই বোঝা যায় না।"

নিস্ফল আক্রোশে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শূন্যে আঘাত করিলাম।

"সব কথা ত' বলি না দেবী। তুলি কি কথা ছাড়া আর কিছুই বোঝা না? আমার চাউনি, আমার কণ্ঠস্বর—"

দেবী এইবার থামিল, মুখে তাহার গাম্ভীর্য্যের অন্ধকার বাহিরের অন্ধকারের মতই নিবিড় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠদ্বয় হইল দৃঢ়সংবদ্ধ। সে যেন প্রস্তর প্রতিমার মত প্রাণহীন, শীতল হইয়া গেল—সে যেন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। ভয় লাগে, আমার ভয় লাগে।

দেবী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বুঝি কিন্তু এমন করে তুমি আর কথা বলো না—নিজের কষ্ট বাড়িয়ো না, আমাকেও কষ্ট দিও না—"

নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। কথা খুঁজিয়া পাই না।

দেবী ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল—তাহার কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হইল—"চল্লাম—"

সে চলিয়া গেল। তাহার প্রতি পদক্ষেপের তালে তালে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ধ্বনিত হইল। সে চলিয়া গেল।

বাহিরে কি সূচীভেদ্য অন্ধকার! নিবিড় কৃষ্ণ আকাশপটে কয়েকটা

নক্ষত্রের হৃদপিণ্ড ধুক্ ধুক্ করিতেছে। আমার মত। সময় কাটে। সময়ই জীবন।

"খেতে আয় খোকা—" মা ডাকিলেন।

চমক ভাঙ্গিল।

"খাব না মা—ভাল লাগছে না।"

মা বিরক্ত হইলেন—"তোর কথা শুনে গা জ্বালা করে বাপু—খেতে চল—" মায়ের কণ্ঠে আদেশ।

উঠিলাম। কিন্তু পা চলে না। দেহে যেন রক্ত নাই।

চলিতে চলিতে হঠাৎ মা একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছিস্ খোকা—"

"এঁ্যা ?"

"দেবীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—আস্‌ছে বোশেখে—"

"কি বল্লে ?" রুদ্ধকণ্ঠে পশুর মত দুর্ব্বোধ্যভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

"হাঁ রে-পাত্র নাকি বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার।"

নিজের অন্ধকার কক্ষকোণে আবার দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিলাম!

"ওকি কোথায় যাচ্ছিস ?" মা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

উত্তর দিলাম না। মস্তিষ্কে ঝড় উঠিয়াছে। উত্তপ্ত রক্তস্রোতের।

কক্ষের ভাঙ্গা হ্যারিকেনকে এক ফুৎকারে নিভাইয়া অন্ধকারের আলিঙ্গনে নিজকে সঁপিয়া দিলাম, নিজের মাথার কেশরাশীকে বারংবার টানিয়া ছিঁড়িলাম। অপরিসর কক্ষের এদিক ওদিক পায়চারী করিতে করিতে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। নবেন্দু ঘোষ, দুঃখ পাইও না। কিন্তু নিজেকে ত' নিজে বোঝান যায় না।

বসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম। নিরাশ হইব না। আসুক বৈশাখ

মাস আর বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার, যাউক এ সপ্ন সৌধ ভাঙ্গিয়া তবুও আমার ভালবাসা মিথ্যা নয়, তবুও আমি বলিব—

"তোমারে বেসেছি ভালো, এই মোর জীবনের
একমাত্র অহঙ্কার হোক্,
আর সবি মুছে' যাক্। সাগর-সৈকতে আঁকা
শিশুর নিরর্থ লিপি-সম
মৃত্যুর তরঙ্গ-ঘাতে ভেসে যাক্ ভিত্তিহীন,
শূন্যগর্ভ সব কীর্ত্তি মম,
কিছু ক্ষতি মানিবো না।"

কেবল আমার একথা দেবীই আর শুনিতে পাইবে না। হায়।

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

আমার চোখে ঘুম নাই।

আমার কথায় দেবী কষ্ট পায়? কেন? দেবী যদি সবই বোঝে তবে মুখ ফুটিয়া বলে না কেন? দেবী কি আমায় ভালবাসে না? দেবী, তোমার হৃদয়ে কি জীবন্ত আত্মা নাই। বৈশাখ মাস। একদিন নহবৎ বাজিবে, হুলুধ্বনিতে গৃহ মুখর হইবে, বিলাত ফেরৎ এক সৌভাগ্যবান যুবক আসিবে, চন্দন-চর্চ্চিতা দেবী যাইবে নবগৃহে আর আমি জীবন্মৃত হইব। কেন মিথ্যা কথাই বা দেবী বলিল না? আঃ, যদি দেবী বলিত—হ্যাঁ, বুঝি যে তুমি আমাকে ভালবাস, যদি বলিত যে আমিও তোমাকে ভালবাসি—তবে সেই মুহূর্ত্তে সব ভুলিতাম, শূন্যে শূন্যে নিজের আনন্দাপ্লুত সাগ্নিক আত্মাকে বিচরণ করিতে দিয়া চলিয়া যাইতাম দূরে—দূরে—দূরান্তরে।

রাত্রি গভীরতর হইতেছে।

আমার চোখের ঘুম আজ নিরুদ্দেশ।

আজ রবিবার। ছুটি। আজ আর আমায় প্রেসে যাইতে হইবে না।

খুব সকালে উঠিয়া আবার বসিলাম। লিখিতে হইবে। রাত্রে ঘুম না হওয়ায় চোখ জ্বালা করিতেছে।

মৃদুবায়ু ঘরের ভিতর আসিতেছে। এলোমেলো ভাবে।

ভাস্করকে খুঁজিয়া পাইলাম রাজপথে। কাপড়ের পুটলীটা দক্ষিণ বগলে চাপিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে।

একটি গলির ভিতর সে ঢুকিল। মিটমিটে ল্যাম্পপোষ্টের ক্ষীণ আলোতে আলোকিত গলি! ভালভাবে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া ভাস্কর দেখিল যে গলিটি বস্তির ধারে গিয়া শেষ হইয়াছে।

ডানপাশে একটি দ্বিতল ও চুনকাম-খসান স্থবির বাড়ী—তাহার ফটকে লেখা আছে—'একটি ঘর ভাড়া দেওয়া যইবে।'

ভাস্কর থামিল। রুদ্ধদ্বারে গিয়া সে করাঘাত করিল।

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল—"কে?"

ভাস্কর পরুষকণ্ঠে বলিল—"নাম বললে চিনবেন না, আমি মানুষ।"

ভিতরের নারীকণ্ঠ এবার আরও মৃদু হইল, "কাকে চান?"

"বাড়ীর কর্ত্তাকে, আমি ঘরভাড়া নেব।"

"ওঃ—আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি—"

দরজা খুলিয়া গেল। দ্বারপথে দেখা গেল একটি যুবতীকে! ময়লা লালপাড় শাড়ী পরণে, রোগা, মুখটা লম্বাটে, চোখ দুইটি ধারালো ও বড় বড়, নাকটি তীক্ষ্ণ, বর্ণ যেন অগ্নিশিখার মত। দ্বারপথে দাড়াইয়া সে ভাস্করকে দেখিয়া কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল, মাথাটা নুইয়া পড়িল, দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিল।

ভাস্করও তাহার দিকে চাহিল। সে একটা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই যুবতী কথা বলিল। উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর, কাব্যের মত মিষ্ট কিছুই

বলিল না, কপালকুণ্ডলার মত বলিল না যে 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' পরিবর্ত্তে শুধু শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"আপনি এই ঘরেতে বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।"

ভাস্করের কাণে কাণে বলিলাম—"নায়ক, প্রেমে পড়ো না—সাবধান।"

ভাস্কর সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিল, "প্রেম! সে আবার কি জিনিষ মশাই?"

ত্বরিতকণ্ঠে বলিলাম—"ও জান্‌তে চেয়ো না ভাস্কর, ও একটা ব্যাধি।"

ভাস্কর হাসিল, "ব্যাধির প্রতি আমার লোভ নেই মশাই।"

যুবতীটি চলিয়া গেল।

ভাস্কর ত আমার মত মানুষ নয়, তাই সে যুবতীটির রূপ, গমনভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইল না। সে যদি নবেন্দু ঘোষ হইত তবে হয়ত এই মুহূর্ত্তে মনে মনে কাব্য রচনা করিত। পরিবর্ত্তে সে পায়ের ছিন্ন ক্যাম্বিসের জুতা জোড়া খুলিয়া ধুলিমলিন পদদ্বয় নাচাইতে বসিল।

বাহিরে হাঁক শুনা গেল—"চাই-ই—ঘুগ্‌নী দা-না -"

ভাস্কর উঠিয়া দাড়াইল, পকেটে হাত দিয়া সঞ্চয়ের থলি খুলিয়া দেখিল এক টাকা দু'আনা সম্বল। দু'আনিটি লইয়া বাহিরে গিয়া সে ঘুগ্‌নীওয়ালাকে ডাক দিল।

"দু'পয়সার দাও ত' হে।"

লোকটি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় সেই অপূর্ব্ব জিনিষ তাহাকে দিল।

"একটু ফাউ দাও ভাই।"

"কি যে বলেন বাবু—এক পয়সায়—"

"ছিঃ, ছিঃ—তোমায় ভাই বলে ডাকলাম—তুমি উল্টে নিরাশ করছ ?"

ঘুগ্‌নীওয়ালা আরও এক চামচ দিয়া হাসিয়া বিদায় লইল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া ভাস্কর তাহা গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় আট ঘণ্টা সে কিছুই খায় নাই।

একটা বিরাট হাঁচির শব্দে ভাস্কর বিষম খাইয়া পিছন দিকে চাহিল। পশ্চাতের দরজা দিয়া একটি খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও গোলাকার লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পরিধানে একটি কালোপাড় শাড়ী, স্কন্ধে একটি গামছা।

লোকটি একগাল হাসিয়া বলিল—"ভয় পাবেন না মশাই—হেঁ হেঁ—আমিই এই বাড়ীর মালিক।"

"ভয়! আমি ভয় পাই নি মশাই—বিষম খেয়েছি।"

"তা ত' দেখতেই পাচ্ছি—হেঁ হেঁ, আমার নাম শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী।"

"ওঃ—নমস্কার, দাঁড়ান এই খাবারটা খেয়ে নিই আগে।"

"বেশ ত' বেশ ত'—"

ঠোঙ্গাটা বাহিরে ফেলিয়া ভাস্কর বলিল—"মশাই, একটু কষ্ট করতে হবে—"

"বিলক্ষণ!—"

"এক গ্লাস জল—"

"এই যে দিচ্ছি—বহ্নি—"

"এ্যা—আগুন জ্বালাবেন নাকি ?"

"হেঁ হেঁ বহ্নি—বহ্নি কুমারী—আমার কন্যার নাম। এক রাজপুত বন্ধুর দেওয়া নাম।"

"ওঃ—"

দ্বারপার্শ্ব হইতে কে যেন সরিয়া গেল।

"তা—মশাই কি ঘর ভাড়া নেবেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"তা বেশ, দুটি বড় ঘর—রান্নাঘর—বাথরুম—সব আছে—হেঁ হেঁ ভাড়া মাত্র দশ টাকা নেব।"

পূর্ব্বদৃষ্ট সেই যুবতীটি জল লইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া ভাস্কর তাহার দুই চোখের জ্বালাময়ী দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। বহ্নি নাম সার্থক হইয়াছে।

জলপান করিয়া ভাস্কর বলিল—"ধন্যবাদ বহ্নিদেবী—"

বহ্নি হাসিল। তাহার দুইটি গালে দুইটি সুন্দর রক্তিম টোল পড়িল, এক সারি সুবিন্যস্ত শুভ্র দন্তরাজি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল, চোখের কোণে জ্বলিল বহ্নিশিখার অপূর্ব্ব জ্বালা।

নিরুত্তরে গ্লাসটি লইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

"আপনাকেও ধন্যবাদ মশাই"—ভাস্কর বলিল।

"হেঁ—হেঁ—কি যে বলেন—"

"হ্যাঁ এবার বলুন দেখি কত ভাড়া নেবেন—দশ টাকা ত' দিতে পারব না—"

"তার কমে যে হবে না।"

"তাহলে চললাম"—ক্যাম্বিসের জুতাজোড়া আবার সে পরিতে বসিল।

"আরে বসুন না মশাই—বসুন—তা আপনি কত দেবেন?"

"ছ' টাকা—"

"দেখুন আপনার কথাও থাকু—আমার কথাও থাক, সাত টাকা দেবেন।"

"উহু মশাই—সাড়ে ছ'টাকা পর্য্যন্ত হবে।"

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী নিজের প্রশস্ত টাকে হাত বুলাইয়া একটু ভাবিয়া লইল, আচ্ছা—থাকুন তবে—"

"বেশ—বেশ—"

"তা আপনি কখন আসবেন ?"

"কখন আবার—আমি ত' এসেইছি—"

ঘনশ্যামের চক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল, "আপনি কি একা থাকবেন ?"

"হ্যাঁ—"

"জিনিষপত্তর আনবেন না ?"

পুঁটলীটি পার্শ্বদেশ হইতে তুলিয়া ভাস্কর হাসিয়া বলিল—"এই যে সঙ্গে আছে।"

ঘনশ্যাম মুহূর্ত্তে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। এ কেমন ধারা লোক ? সুবিধার মনে হইতেছে না। অথচ চেহারায় ত' বেশ ভদ্রলোক।

সে বলিল—"তাহলে এ মাসের ভাড়াটা অগ্রিম দিন—"

ভাস্কর হাসিল, "কি যে বলেন মশাই—এই দেখুন—" পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থিত একটাকা ছ'পয়সা বাহির করিয়া সে বলিল—"এই সম্বল আমার। একটা কিছু জুটিয়ে নিই—আপনার ভাড়া মারা যাবে না। এ কথা আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি—"

ঘনশ্যামের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, সে একটা কিছু বলিতে যাইবার পূর্ব্বেই ভিতর হইতে বহ্নির গলা ভাসিয়া আসিল—"ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়ে দাও বাবা—"

"এ্যাঁ ? কিন্তু—"

সতেজ কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল—"দিয়ে দাও বাবা"

নিস্তেজভাবে ঘনশ্যাম বলিল—"আচ্ছা, হেঁ হেঁ—তাহলে থাকুন মহাশয়ের নাম ?"

"ভাস্কর।"

"উপাধি।"

ভাস্কর মাথা চুলকাইতে লাগিল।

কানে কানে বলিলাম—"মাথা চুলকো না—তোমার উপাধি—মানুষ।"

ভাস্কর বলিল—"আমি মানুষ মশাই—ঐ আমার সবচেয়ে বড় উপাধি।"

ঘনশ্যাম বোকার মত হাসিল—"হেঁ হে—আপনি অদ্ভুত লোক ! আচ্ছা, আপনি তাহলে যা গোছাবার গুছিয়ে নিন্—এই ঘর পাশের ঘর সব খালিই আছে—আমি যাই—আমার পূজো বাকি আছে।"

"পূজো ! কিসের পূজো ?"

"নারায়ণের।"

"নারায়ণ কি মানুষের চেয়ে বড় ?"

"হেঁ হেঁ—কি যে বলেন—"ঘনশ্যাম হাসিতে হাসিতে ভিতরে গেল।

ভাস্কর কক্ষের এদিক ওদিক তাকাইল।

দ্বারপার্শ্বে বহ্নিকে আবার দেখা গেল।

ভাস্কর বলিল—"আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"কেন?"

"আপনার জন্যই ঘরভাড়া পেলাম।"

"তাতে ধন্যবাদের কি আছে—জানেন—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ?"

ভাস্কর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সত্যি ভারী আনন্দ হল—আপনার নাম সার্থক হয়েছে—"

তাহার উচ্চ হাসিতে সারা ঘর কাঁপিয়া উঠিল—সে হাসির শব্দে বহ্নির গালে আবার হাল্কা রক্তের আভা বারংবার খেলা করিতে লাগিল। একদৃষ্টে সে ভাস্করের দিকে চাহিয়া রহিল।

জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম—সূর্য্য উঠিতেছে। পূর্ব্ব দিগন্তের দু'একটি মেঘখণ্ডে তাহারই রক্তপতাকা। বহ্নির গালের রক্তিমাভার মত। দেবীর গালেও একদিন অমনি লোহিতরাগ দেখিয়াছিলাম। সেদিন আমার রক্তে মুগ্ধবিস্ময়ের শিহরিত কাব্য সেই রূপের স্তুতিপাঠ করিয়াছিল। বৈশাখ মাস। মানুষ ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারে না কেন?

"দাদা—"

শোভা আসিয়া ডাক দিল।

"কি রে?"

"মা বলছে যে বাজারে যেতে হবে।"

"বাজার! কিন্তু পকেটে যে এক আনা পয়সা মাত্র।"

শোভা চুপ করিয়া থাকিল।

হাসিয়া বলিলাম, "দে না ভাই কয়েকটা টাকা—তোর ত' আজকাল গিন্নি হয়েছিস্।"

শোভার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। ব্যথিত হইলাম। সব কথা সব সময়ে মনে থাকে না। সত্যি, আমার ত' এরূপ পরিহাস করা উচিত নয়। এক বৎসর হইল শোভার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু স্বামীগৃহে সে ছিল মাত্র তিন মাস। তাহার স্বামী বেচারা এখনও বেকার।

ব্যাপারটা লঘু করিবার জন্য বলিলাম—"মুখ কালো করলি কেন? তোরা অন্নপূর্ণার জাত—তোদের কাছে আমরা চিরদিনই হাত পাতব—তোদের না থাকলেও—"

শোভা ক্ষীণ হাসি হাসিল। শোভা একটু সংযতবাক, বিবাহের পর হইতে তাহা আরও বাড়িয়াছে।

"যাচ্ছি বাজারে—মাকে বলগে।"

বাহির হইলাম। সূর্য্য উঠিয়াছে।

রাস্তার মোড়ে দেবীদের বাড়ী। বিরাট অট্টালিকা। চাহিলাম। নিজেকে ক্ষুদ্র, অসহায় মনে হইল। রাস্তার পার্শ্বের একটি অশ্বত্থ গাছে অজানা একটি পাখী ডাকিতেছে। আঃ, যদি পাখী হইতাম—

বিকাশের বাড়ী গিয়া দেখি বিকাশ মুখ ধুইতে বসিয়াছে।

"কি রে, এত সকালে?" সে প্রশ্ন করিল।

"দরকার আছে ভাই।"

"কি?"

"একটা টাকা দে বড় টানাটানি—"

বিকাশ একধরণের অদ্ভুত হাসি হাসিল, মিথ্যাবাদীরাই সেরূপ হাসে পাগল! কোথায় পয়সা?"

"বড় দরকার কিন্তু—"

"নেই—মাইরি বলছি—"

বিকাশ অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিল, বেশ বুঝিতে পারিলাম। মিথ্যাকে ঢাকা যায় না।

"চল্লাম তাহলে—"

"চা খাবি না?"

নিঃশব্দে হাসিয়া নিরুত্তরে বাহির হইয়া চলিলাম।

রাস্তার একপার্শ্বে একটি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ ভিক্ষুকের সন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, মানুষ দেখিলেই তাহার হাত প্রসারিত হইয়া পড়ে, মুখে গোঙানীর শব্দ ধ্বনিত হয়। আমাকে দেখিয়াই বলিল—"বাবু—দয়া করুন—"

মানুষের প্রেতের দিকে একবার চাহিয়া আগাইয়া চলিলাম। কে ভিক্ষা দিবে? আমি? আমিও ত' ভিক্ষুক। আমার নায়ক মানুষের এই ভিক্ষাবৃত্তিকে দূর করিবে। হে অনাগত অতিমানব, আমার স্বপ্নকে তুমি সার্থক করিও।

যোগেশ'দার ওখানে পৌছিলাম। লোকটি ভাল। কিন্তু তাহার নিকট কোনও দিন হাত পাতি নাই, লজ্জা বোধ হয়। তবুও উপায় নাই।

"যোগেশ দা—একটা টাকা চাই আজ—"

"বটে! ভারী অন্যায় ত'—" যোগেশদা' হাসিল।

"বড় দরকার—"

"বেশ একঘণ্টা আমার স্তুতিপাঠ কর।"

"আপনি বড় ভাল লোক—"

"বেশ—বেশ—ওরে রামু—দুকাপ চা আর জলখাবার নিয়ে আয় রে—"

হাসিলাম।

"হাসিস্ না—আমি ভক্তদের ভালবাসি! এই সকালে এক কাপ

চা তুই হেন ভক্ত না খেলে ব্যথা পাব। ভয় পাস্ না—দক্ষিনাও পাবি।”

বাজার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আবার আমার ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোণে আসন গ্রহণ করিলাম। বাহিরে রৌদ্রের তেজ একটু প্রখর হইয়াছে। ভাবি। ভবিষ্যতে কি হইবে? মানুষের অন্ধতা, কুসংস্কার, ভেদাভেদ আর পশুত্ব কবে দূর হইবে? আমার নায়ক কবে সত্য হইবে?

কু-হু—। কোকিল! কোকিল ডাকিতেছে! বসন্ত! উদগ্রীব হইয়া জানালার ধারে অগ্রসর হইলাম। সমস্ত শরীরে হঠাৎ একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

বসন্ত আসিয়াছে। শীতের জরাকে নবকলেবর দান করার ইন্দ্রজাল আরম্ভ হইয়াছে—গাছে গাছে নবীন পল্লবগুলি সূর্য্যালোকে চক্‌চক্ করিতেছে, এলোমেলো বায়ুবেগে অনুরাগভরে কাঁপিতেছে। আকাশ ঘননীল—শ্বেতমেঘের নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে সেই নিবিড় নীল শূন্যপথ দিয়া, দুই একটা চিল স্থিরপক্ষ হইয়া আলস্যে শূন্যপথে দেহ এলাইয়া নীচের পৃথিবীর দিকে চাহিতেছে, মাঝে মাঝে তাহাদের ডানাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে। বসন্ত আসিয়াছে। জীবনের স্পন্দন যেন অনুভব করিতেছি।

কু-হু—। বসন্ত আসিয়াছে। বাতাসের মধ্যে একটা মদির স্পর্শ, তাহাতে কোকিলের ডাকের সহিত অস্পষ্ট ও রোমাঞ্চকর জীবনের সঙ্গীত যেন ভাসিরা আসে। এই পৃথিবী কি সুন্দর! সবই ত' আছে, তবুও খারাপ কেন? কবে এই মৃত বর্ত্তমান, অতীত হইবে?

“কি ভাবছ ভাই মেজদা?—”

“এঁ্যা?” চমকিয়া পিছন ফিরিলাম।

গৌরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুরন্ত প্রাণাবেগে উচ্ছল

ঝরণার কল্ কল্ শব্দের মত গৌরীর হাসি। তাহা বাতাসে ভাসিয়া গেল। যে বাতাসে আছে কোকিলের ডাক আর রোমাঞ্চকর জীবনের অস্পষ্ট সঙ্গীত, যে বাতাসে আছে বসন্তের বার্ত্তা।

"কি ভাব্ছিলে মেজদা?"

"কি জানি—"

"ওমা! তবে মন বুঝি কোথাও উড়ে গেছে?"

"হ্যাঁ—"

"কোথায়?"

"বাইরের আকাশ আর বাতাসকে জিজ্ঞেস কর।"

"তুমি পাগল মেজদা—"

"হু—"

গৌরী আমার উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া আকুল হইল। হাসিতে হাসিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিরের গাছের কচি পাতাগুলির মত কাঁপিতে থাকে। গৌরীকে বসন্তের আত্মা স্পর্শ করিয়াছে। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে এই সরলা বালিকার হাসি দেখি, মুগ্ধ হই।

"মাসীমাকে গিয়ে বলছি—"

"কি?"

"এই রকম মন উড়ে যাওয়া ভাল নয়।"

"তারপর?"

"একটা রাঙ্গা মুখ ঘরে আস্‌লে মনপাখী আর উড়বে না।"

চোখে জল আসে। রাঙ্গা মুখ! দেবী। বৈশাখ মাস। আমার জীবনের রাঙা মুখের ইতি ঘটিবে ঐ মাসে। গৌরীর দিকে চাহিয়া শুধু বলিলাম,—"গৌরী, ও ঠাট্টা আমায় করো না ভাই—"

গৌরী আমার ভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল—"কেন?"

হাসিয়া বলিলাম—"ব্রহ্মচারী মানুষ—রাঙা মুখের মোহ আমার নেই—"

"ইস্"—গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—"ইস্—বড় সাধু সাজছ!"

কু-হু—! 'আমি ঋতুরাজ—আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।"

"গৌরী ভাই—"

"কি ভাই মেজদা?"

"একটা কথা রাখ—"

"বল—"

"একটি গান শোনাবে?"

"গান!" গৌরী চোখ বড় করিয়া বলিল—"ওমা! আমি কি গান জানি?"

"খুব জান—একটা শুনাও না—ভারী শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

"বাঃ রে—না জানলে কোত্থেকে শুনাব?"

"তুমি জান। সত্যি গাও না, তোমার এই অধম মেজদা প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করবে'খন যাতে তোমারও দেবীরমত বিলেত ফেরৎ বর জোটে—

চঞ্চলা কুরঙ্গীর মত চক্ষুতে কপটরোষ হানিয়া গৌরী বলিল—"মাগো তুমি কি! তুমি ভারী দুষ্ট মেজদা—যাও—"বলিয়াই আবার সেই হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বিদ্যুদ্বেগে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাসিলাম।

এলোমেলো বাতাসের সহিত কোকিলের ডাক আবার ভাসিয়া আসে। সমস্ত পৃথিবীর নব-যৌবনের ডাক। রহস্যকালো অতীন্দ্রিয় জগতের ডাক।

মধ্যাহ্নে পশ্চিমের বায়ুবেগ আরও প্রখর হইল। এ পশ্চিম দেশ—এখানকার বাতাস মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। আহারজনিত আলস্যে

শুইয়াছিলাম, হঠাৎ মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতার সুর বড় ভাল লাগিল! উঠিয়া বসিলাম, কক্ষের সমস্ত জানালাগুলি পরিপূর্ণভাবে খুলিয়া দিলাম। হু হু করিয়া পশ্চিমের বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিল—সঙ্গে আসিল বসন্ত—সমস্ত দেহ আমার মুহূর্তে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

বাহিরে চাহিয়া অপরূপ বিস্ময়ে সমস্ত মন বিমূঢ় হইয়া গেল। নব-নির্ম্মিত খড়্গের মত সূর্য্যালোক ঝলসাইতেছে, দর্পণের মত স্বচ্ছ আকাশে মেঘের মালিন্য নাই। বায়ুবেগে গাছের সবুজ পাতাগুলি দুলিতেছে, নাচিতেছে, আর যত সব পুরাতন, শীতজরায় জর্জ্জর চ্যুতপত্র মৃতপত্র বিয়োগের মর্ম্মরশব্দ তুলিয়া নৈরাশ্যের ক্লান্ত গীত গাহিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। মাটিতে গৈরিক তৃণগুলি কাঁপিতেছে—কয়েকটি প্রজাপতি তাহাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীতে চলিয়াছে সৃষ্টির সমারোহ, পুরাতনের বিসর্জ্জন। বসন্ত আসিয়াছে।

ভাবি। বসন্তের অর্থ কি, সবুজ পাতার অর্থ কি? হু-হু শব্দে দুরন্ত বালকের মত পশ্চিমের তপ্তবায়ু আসিয়া কানে কানে বলিল—অর্থ জীবনের জয়।

বসন্ত আসিয়াছে। পৃথিবীর এই রূপ চিরস্থায়ী করিতে হইবে। গৌরীর হাসি যেন বায়ুতরঙ্গে এখনও ভাসিয়া বেড়াইছে। 'আমি সেই অখিলের দুরন্ত যৌবন।'

সহসা আনন্দের একটা ধ্বনি আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। অনুভব করিলাম আমি ভগবান—মানুষই ভগবান। অদৃশ্য শূন্য লোক দিয়া কল্পনার পক্ষীরাজে উড়িয়া চলিলাম। দেবীর কথা মনে পড়ে। ভয় কি, জয় করিব, 'হে কুমারী তুমি মোর চিরকাল তরে।'

চীৎকার করিয়া উঠিলাম। অর্থহীন চীৎকার।

সে চীৎকারে আমার নায়ক সাড়া দিল—"কি হলো নবেন্দু বাবু?"

"বসন্ত এসেছে—"

"বটে ! তাতে হয়েছে কি ?"

"অনুভব করছি যে আমি বেঁচে আছি—বাঁচতে হবে।"

"তা ত, দেখতে পাচ্ছি—"

"ভাস্কর, ঠাট্টা নয়—তাকিয়ে দেখ পৃথিবীর দিকে, বাইরের চোখ নয়, অন্তরের অদৃশ্য চক্ষু দিয়ে দেখ, কান পেতে শোন অস্পষ্ট সঙ্গীতের ভাষা—"

ভাস্কর বাহিরের দিকে চাহিল।

ঘরের ভিতর পশ্চিমের বাতাসে আসে ধূলার আবির—আসে বহু-পুরাতন মৃত্তিকার চিরনবীন প্রণয়-লিপি।

ভাস্কর দুই হাত মেলিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল—দেখছি—শুনছি—হ্যাঁ—বাঁচতে হবে—"

উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলাল,—"তোমার কাজ এবার সুরু করে দাও নায়ক—আর দেরী নয়—"

ভাস্কর মাথা নাড়িল।

ক্যাম্বিসের জুতাজোড়া পরিয়া সে কক্ষ হইতে বাহিরে পা দিল।

পশ্চাতের দ্বার দিয়া বহ্নি প্রবেশ করিল, তাহার আলুলায়িত কেশের সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে।

"কোথায় চল্লেন এই দুপুরে ?"

"বহ্নিদেবী, আপনি কি বেঁচে আছেন ?"

বহ্নি বিস্মিত হইল—"কি ব্যাপার ? বেঁচে আছি বই কি।"

ভাস্কর বলিল—"সে বাঁচা ত' মৃত্যুর সমান—তা নয়।"

"তবে ?"

"ফুলের মত সুন্দরভাবে বাঁচতে হবে।"

বহ্নির চোখে বহ্নি জ্বলিল—"মানুষ কি ফুল হয় ?"

"হবে—তারই সাধনা আমায় করতে হবে—"

বহ্নি হাসিল।

ভাস্কর চলিতে আরম্ভ করিল।

"এই রোদ্দূরে সেই সাধনায় আনন্দ পাবেন কি ?" বহ্নি লঘুহাস্যে বলিল।

"চেষ্টা করিগে—"

গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হইল।

ঘরের ভিতর দমকা হাওয়ায় ঘূর্ণী আসে। আসে আম্রমুকুলের মৃদু সুবাস। তালগাছের পাতাগুলি সশব্দে দুলিতেছে। দূরের পলাশবৃক্ষে রক্তের মত লাল ফুলগুলি সগর্ব্বে মাথা নাড়িতেছে। আজ কতই ? ১০ই ফাল্গুন। বৈশাখ মাস। মোড়ের বড় বাড়ীটা একদিন আলোকিত, কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠিবে, সখীরা সকলে দেবীকে সেইদিন সাজাইতে বসিবে, লজ্জা ও পূর্ব্বাশার মৃদু চিহ্ন তাহার ললাটের দুই একটি ঘর্ম্মবিন্দুর মাঝে চক্‌চক্ করিবে, আর একজন হতভাগ্য লেখক তাহার অপ্রশস্ত কক্ষের কোণে অন্ধকারে বসিয়া বারংবার মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাইবে। দূরের পলাশফুল আমার রক্ত অমনি লাল ছিল—কিন্তু আর নাই—এখন তাহা মৃত্যুর পাণ্ডুরতায় আচ্ছন্ন। কতই বৈশাখ ?

বৈকাল হইল। বায়ুবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইল, উত্তপ্ত আবহাওয়া ক্রমে স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হইল আর পশ্চিমের আকাশে সূর্য্যের আসন্ন অস্তের আয়োজন চলিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বাতাসের মত মনটা অধীর ও তপ্ত হইয়া উঠে, হু হু করে। দেবীকে দেখতে ইচ্ছা হয়। তাহাকে যেন দীর্ঘযুগ দেখি নাই।

পরিষ্কার একটি ধুতি পরিলাম, ছিন্ন পাঞ্জাবীটাকে একটি সাদা চাদর মুড়ি দিয়া লুক্কায়িত করিলাম। তাহার পর সূর্য্য যখন অস্ত গেল, আর তাহার অন্তিমবার্ত্তা যখন একদল উড্ডীয়মান বন্যহংসের কণ্ঠনিঃসৃত দুর্ব্বোধ্য কাকলীতে ধ্বনিত হইল তখন বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। দেবীদর্শনের জন্য প্রেমিক তীর্থযাত্রীর মত, কম্পিত অনুরাগ বুকে লইয়া চলিলাম। চলিলাম।

পৌঁছিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দেবী গান গাহিতেছে। রবীন্দ্রনাথ।

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বারে।"

নিঃশব্দপদে ভিতরে ঢুকিলাম।

দেবীর মা রান্নাঘরে রাঁধুনীদের কি সব বলিতেছিলেন, আমায় দেখিয়া সহাস্যমুখে আহ্বান করিলেন, "এসো বাবা—এস—"

"আগে দেবীর গান শুনে আসি জ্যাঠাইমা—"

দেবীর মা হাসিলেন, "আচ্ছা বাবা তাই যাও—"

সিঁড়ি বাহিয়া চুপি চুপি উপরে উঠিলাম। মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে অর্গান বাজাইয়া দেবী গাহিতেছে। সে আমাকে দেখিতে পাইল না।

চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। শুনিতে লাগিলাম। আকাশে চাঁদ নাই বটে—কিন্তু অগণিত নক্ষত্রের স্পন্দিত আলোকে তাহা ভাস্বর।

"বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার॥"

বারংবার দেবী গানটি গাহিল, নানা ভঙ্গীতে, কখনও উঁচু পর্দ্দায়, কখনও অস্পষ্ট মৃদু বিলাপের মতো, অনুযোগের মত করিয়া দেবী গানটি গাহিল। তাহার সুরের ইন্দ্রজাল আমার সমস্ত চেতনার মর্ম্মকোষে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তোলে। কাঁপিতে থাকি। কে এই 'বন্ধু'? সে কি আমি? কেন এই বিরহের গান? ক্ষুদ্র তৃণের মত তাহার কণ্ঠস্বরের আঘাতে আমি কাঁপিতে থাকি, আমার চোখে জল আসে।

গান শেষ হইল।

সে পিছন ফিরিয়া চাহিল, আমাকে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি! কখন এলে?"

কথা বলিতে গিয়া দেখি কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেছে।

"এসো, ভেতরে এস।"

ভিতরে গেলাম। বসিলাম।

"ও কি! তোমার চোখে জল কেন? সে নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিল।

হাসিয়া চক্ষু মুছিলাম।

বলিলাম—"কাঁদছিলাম।"

"কেন?"

"তোমার গান শুনে।"

"তাতে কাঁদতে হয় নাকি ?"

"আমার ভাল লাগল, আনন্দ হল, আনন্দেতে কি মানুষ কাঁদে না ?"

"শুনেছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস হ'ত না।"

"এবার বিশ্বাস কর।'

হঁ্যা—তা কর্চ্ছি, কিন্তু তুমি একেবারে পাগল।"

"সবাই তাই বলে বটে।"

সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। গৌরীর হাসি। বসন্ত আসিয়াছে।

নিষ্পলকনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকি। কত যুগ যেন তাহাকে দেখি নাই। আজ তাহার সাজসজ্জা বড় বেশী রকমের মনে হয় কেন ? ঠোঁট দুইটি আজ অধিকতর রক্তবর্ণ, কাণে আছে হীরার দুল, মাথার খোঁপা আজ আরও পরিপাটিরূপে বাঁধা, পরণে আজ আকাশের মত নীলবর্ণের শাড়ী, তাহার জরীর পাড় বিদ্যুতের মত জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। আকাশে আজ চাঁদ থাকিবে কি করিয়া, সে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হইয়া তাহার দুই চোখে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তকের কেশরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া অলক্তক-রঞ্জিত পদদ্বয় পর্য্যন্ত তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করি আর মুগ্ধ হই। তাহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া গর্ব্ববোধ হয়, নিজেকে ধন্য মনে হয়।

"কি অত দেখছ বল ত ?"

"তোমায়—ভারী ভাল লাগছে দেখতে। তুমি এত সুন্দর !" কতবার এইকথা বলিয়াছি !

"আমি যে কুঁকড়ে যাচ্ছি লজ্জাবতী লতার মত।" সে সলজ্জহাস্যে বলিল।

"কেন ?"

"তোমার চাউনী ভারী অদ্ভুত, ভয় করে।"

দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া হাসিলাম—"কি করব, তুমি সুন্দর হয়েছিলে কেন ?"

"শোভাকে আনলে না কেন ?"

সে কথার মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা করে। গত কল্যকার মত। কেন ? কেন দেবী আজ ইন্দ্রানীর মত সাজিয়াছে ? সে কি আমার জন্য !

বলিললাম—"দেবী—।" কাল যে কথা বলা সমাপ্ত হয় নাই, আজ তাহা শেষ করিবার ইচ্ছা হইল।

দেবী যেন বুঝিতে পারিল, পুনর্ব্বার আমার কথা এড়াইবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল—"না, আনলেই পারতে বেচারীকে—"

বলিলাম—"দেবী—আমার কথা আজ শুনতেই হবে।"

সে থামিল' আমার দিকে মুহূর্ত্তেক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, "যা বলবে তা ত' আমি জানি—"

নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করি, "কি জান ?"

"তুমি আমায় ভালবাস।"

মাথা নীচু করিয়া বলিলাম—হ্যাঁ—কিন্তু তুমি ?"

তরল হাস্যে সে বলিল—"বেশ ত' ভালবাস তুমি আমায়, ভালবাসায় দোষ কি।"

ভীতকণ্ঠে উত্তরাশায় প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু তুমি ? তুমি কি আমায় ভালবাস না ?"

সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অর্গানের উপরিস্থিত ফুলদানী হইতে একটি রক্তগোলাপ আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"তুমি না ফুল ভালবাস—নাও এটা—

ফুলটা লইলাম। ফুলটাই কি উত্তর, না, তাহা নয়। ফুলটা এ আলোচনার সমাধির ইঙ্গিত। কিন্তু কেন ? কেন এই অবহেলা, এই শুষ্কতা ? ভাবি।

ঘরের ভিতর চাকর প্রবেশ করিল।

"দিদিমণি, মিত্রসাহেব এসেছেন—

"এঁ্যা !—মুহূর্ত্তে দেবীর মুখে কে যেন অদৃশ্যহস্তে আবির মাখাইয়া দিল, "এসেছেন ? কোথায় ?

"আজ্ঞে নীচে—"

"ওঃ"—আমার দিকে চাহিয়া দেবী তাড়াতাড়ি বলিল—"তুমি বোস আমি নীচে যাচ্ছি—

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম না।

চাকরটি আবার বলিল—"তিনি ওপরেই আসছেন, আপনাকে নীচে যেতে হবে না—

"ওঃ"—আবার দেবী উচ্চারণ করিল—"ওঃ—একবার অসহায়ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কি যেন বলিতেও চাহিল।

'মুহূর্ত্তে অজ্ঞানতার তিমিরে বিদ্যুতের সর্পিলভঙ্গী প্রখর দীপ্তিতে খেলিয়া গেল।' আবার অন্ধকার।

উঠিলাম, "তোমার বিশেষ কাজ আছে বলে মনে হচ্ছে—মিত্রসাহেবের সঙ্গে বোধ হয়, আচ্ছা আমি নীচে যাচ্ছি দেবী—"

দেবী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাশ ফেলিল, আবার একটু অপরাধীও বোধহয় বোধ করিল, "নীচে যাবে, আচ্ছা, মায়ের সঙ্গে গল্প করগে, কেমন ?"

মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবার পূর্ব্বে একবার তাহার দিকে চাহিলাম। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুই গভীর শান্ত দৃষ্টির স্বচ্ছ অতলতার মধ্যে আমার স্বপ্নের মৃত্যু। দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম।

সিড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম।

একজন বিদেশীপোষাকপরিহিত দীর্ঘকায় ও সুদর্শন লোক সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। বয়স বোধ হয় সাতাশ আটাশ। মিত্রসাহেব।

লোকটি আমার দিকে চাহিল না, উপরে উঠিয়া গেল।

মাথা ঘুরিতে থাকে। সব বুঝিলাম। কেন দেবী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছিল তাহার অর্থ পরিস্ফুট হইয়া গেল।

নীচে নামিলাম।

জ্যাঠাইমা দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

"বাড়ী—"

"যাবার আগে দুটো চপ খেয়ে যাও—"

"না জ্যাঠাইমা শরীর খারাপ—"

"যাবে!—হ্যাঁ—তুমি শুনলে খুশী হবে বাবা, আসছে ১০ই বৈশাখ দেবীর বিয়ে। পাত্র বিলেত ফেরৎ—"

"কি নাম ?"

"অনিল মিত্র—বছরখানেক ধরে বিলেত থেকে এসে এখানে চাকুরী কর্চ্ছে। ও মা! এইমাত্র সে এল, তাকে দেখ নি ?"

আকাশের নক্ষত্রের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হ্যাঁ—দেখেছি—আচ্ছা জ্যাঠাইমা—চল্লাম—"

"এসো বাবা—আজকাল তোমায় বেশী দেখি না কেন বলত ?"

হাসিয়া বলিলাম—"কাজ বেশী—"

রাস্তায় নামিলাম! কোথায় বসন্তের সঙ্গীত? কোথায় জীবনের বিকাশ ? মৃত্যুর বাষ্পে ভরা বাতাস, মৃত্যুর বিবর্ণতায় পাণ্ডুর নক্ষত্র, চিতার অঙ্গারের মত কালো আকাশ। বাঁচিয়া কি লাভ ?

হাতের ফুলটির দিকে চাহিলাম। লাল ফুল। মৃদু অথচ সুমিষ্ট সুবাস ছড়াইয়া যৌবনগর্ব্বে যেন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কিন্তু কি হইবে এ ফুল লইয়া? হ্যাঁ, ফুলকে ভালবাসি, কিন্তু সে কোন ফুল? যে ফুল আপনি ফোটে, আপনি ঝরে, যে ফুল নিজে চয়ন করি, যে ফুল কেহ ভালবাসিয়া দেয়, দেবীর দেওয়া উত্তাপহীন ফুল নয়।

গভীর বিতৃষ্ণায় ফুলটিকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম।

আবার আমার কক্ষকোণ।

মা প্রশ্ন করিলেন, "আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?"

"ভাল লাগছে না।"

"শরীর খারাপ না তো?"

"না।"

মা কাজে গেলেন।

একাকী ঘরে বসিয়া রহিলাম। সময় কাটে। সময় আমার শত্রু।

রাত বাড়িল। মা খাইতে ডাকিলেন।

"খাব না মা—"

মায়ের ক্রুদ্ধকণ্ঠ ভাসিয়া আসে, "তোর হল কি বলত—"

"কিছু না—"

"খেয়ে যা বলছি—আমার মাথা খাস্—"

"খেয়ে যাও দাদা"—শোভা আসিয়া দ্বারপার্শ্বে উকি মারিল।

উঠিলাম। মাকে দুঃখ দিতে মনে কষ্ট লাগে।

খাওয়া শেষ করিয়া আবার ঘরে বসি। লিখিতে চেষ্টা করি—কিন্তু পারি না, সব যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে।

সামনের বড় অট্টালিকাটির আলোকিত কক্ষগুলি। হঠাৎ একটি

মেয়ের গান ভাসিয়া আসে। যান্ত্রিক সুর। দেবীর কণ্ঠের দরদ কোথায়? গানের সুরের সহিত ভাসিয়া আসে ঘুঙুরের আওয়াজ, কেহ নাচিতেছে।

ভাবি। কি করিব? অন্ধকারে দেবীর মুখ বারংবার ভাসিয়া ওঠে। অনিল মিত্র আর দেবী। ভাল। আমার ভালবাসা কি মিথ্যা?

বড় অট্টালিকা হইতে নারীকণ্ঠের কলহাস্য শোনা যায়। ধনী ও সুখী মেয়েরা, লোকেরা। কিন্তু ঐ সুখ, ঐ ঐশ্বর্য্যই কি আমার কাম্য। না।

রাত গভীর হইতে থাকে।

ভাবি বাঁচিয়া কি লাভ?

আমার নানা গল্পের নায়কেরা সব একে একে অন্ধকারে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের স্রষ্টার দুঃখে তাহারা ব্যথিত হইয়াছে।

'ঈশানপুরের মশানে'র নীলকান্ত আসিয়া কাঁধে হাত দিল। সেই যাত্রার দলের পলাতক, শ্মশান বৈরাগী মদ্যপ যুবক।

"শুনছেন?" নীলকান্ত বলিল, তাহার মুখ হইতে ধেনোর উৎকট গন্ধে আবহাওয়া কলুষিত হইয়া উঠিল।

"কি?"

"এই পৃথিবী অনেক দুঃখের, কিন্তু বিচার করে লাভ নেই।"

"অতএব—"

"ও প্রেমের কথা ভুলুন, প্রেমের চেয়ে বড় প্রয়োজন, আমার মত একটি চণ্ডালকন্যাকে কিংবা আর কাউকে বিয়ে করুন, সব ভুলুন—"

"কিন্তু এযে আত্মবঞ্চনা—"

"এ শ্মশানে ও ছাড়া আর উপায় নেই।"

"আমার কাছে প্রেম প্রয়োজন নয়।"

সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিল—জড়িতকণ্ঠে বলিল—"তবে আমার মত ধেনো খান, এর জ্বালায় বুকের জ্বালা কম্‌বে—"

"তুমি দূর হও নীলকান্ত—"

সে টলিতে টলিতে মিলাইয়া গেল।

এবার আসিল নিরঞ্জন। সেই 'পোষ্ট মর্টেম' গল্পের নায়ক। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ফুলিয়া পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে, পেটের নাড়ী-ভুড়ী বাহির হইয়া আসিয়াছে, মস্তিস্কের খুলি ওলটানো। পচা মাংসের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। বিস্ফারিত, স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে বলিল, "নবেন্দু তুমি আত্মহত্যা কর।"

"কেন ?'

"বেঁচে লাভ কি, তুমি না ভাবছিলে ? তার জবাব দিচ্ছি— বেঁচে লাভ নেই—এজীবন অর্থহীন, প্রেম আরও অর্থহীন—"

"তুমি কি মরে শান্তি পেয়েছ ?"

"তা ঠিক বুঝতে পারি না, তবে জীবনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি—"

"তুমি যাও—ভেবে দেখি।"

"না অত ভেবো না নবেন্দু, যতশীঘ্র পার নিজেকে এ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কর—এপৃথিবীর সব ক্ষয়িষ্ণু, সবঅর্থহীন, বিদুষকের হাসির মত মিথ্যা—"

মরিব কি ? ভাবিতে থাকি।

বীভৎস ও গলিত দেহের দুর্গন্ধে মস্তিষ্ক ঝিম্‌ঝিম্ করিতে থাকে।

নিরঞ্জন বলিতে লাগিল, "তা ছাড়া কিছুই থাকে না—তোমার দেবীব দেহও একদিন পচবে,"আজ তার যে রূপ তা একদিন আমার এই বীভৎস দেহের মতই ভয়াবহ হয়ে উঠবে, ও সব মিথ্যা, অন্ধ হয়ো না নবেন্দু, মর মরে জীবনকে জয় কর—"

রাত্রি অনেক হইয়াছে। ভাবিতে থাকি।

অকস্মাৎ আমার কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। ঝড়ের মত গতিতে আসিল ভাস্কর।

দুই বাহু দিয়া নিজের বক্ষে আঘাত করিয়া সে বলিল, "প্রেতাত্মার কথা শুনবেন না নবেন্দু ঘোষ—মরে নয়, জীবনকে জয় করা যায় পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে, মানুষের মত বেঁচে—"

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার অপসৃত হয়, তেমনি ভাস্করের কণ্ঠস্বরে আমার দুর্ব্বল, বিকৃতমনা নায়কেরা মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

কক্ষের বায়ু লঘু হইল।

ভাস্কর বলিল—"প্রেম কি বুঝি না, কিন্তু তাতে যে আপনি দুঃখ পাচ্ছেন সেটা বুঝতে পাচ্ছি। তা পান, সহস্র দু;খে আপনি পঙ্গু হন, তাতে দুঃখ নাই, তবু বাঁচুন, জীবনের চেয়ে সত্য কিছুই নাই—"

আমার নিঃশ্বাস সহজ হইয়াছে। ভাস্করের কথায় আমার ধমনীতে রক্তস্রোতের নবোদ্যম অনুভব করিতে থাকি। হ্যাঁ, জীবনের চেয়ে সত্য কিছুই নাই।

বলিলাম, "ঠিক বলেছ ভাস্কর, মরব কেন? সহস্র দুঃখ আসুক লক্ষ্য কণ্টকে আমার চরণ বিদ্ধ করুক তবু ভয় নাই—"

ভাস্কর হাসিল।

"চল্লাম, অনেক কাজ আছে—"

সে বাহির হইয়া গেল। মিলাইয়া গেল।

গভীর প্রশান্তিতে আমার সারা হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাই ত, কেন মরিব? বাঁচিব, অপরাজিত জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইব। জীবনের চেয়ে সত্য,বড় কিছুই নাই। লজ্জা বোধ করিলাম। আমি এত দুর্ব্বল? দেবী আমায় নাই বা ভালবাসিল,আমি ত তাহাকে ভালবাসিয়াছি। ভালবাসিয়া যে কি আনন্দ, কি দুঃখ তাহা দেবী না থাকিলে কি করিয়া বুঝিতাম!

দেবী, তোমায় ধন্যবাদ, তোমার নিকট আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। 'তোমারে বেসেছি ভাল, এই মোর জীবনের একমাত্র অহঙ্কার হোক।'

জানালা দিয়া ধীর বাতাস ঘরে আসিতেছে।

হঠাৎ যেন মাথার ভিতর অসহ্য একটা অনুভূতি বোধ করি। লিখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক কথা' অনেক ভাবনার রাশি মাথার ভিতর করাঘাত করিতে থাকে। সব ভুলিয়া যাই। নূতন জগতের আবহাওয়া চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া অসে, সেখানে শুধু আমি আর আমার কল্পনাসৃষ্ট নায়ক নায়িকার দল। কিন্তু এই জগৎ একদিন সত্য হইবে, আর যে জগতে আমি বাস করিতেছি তাহা ধোঁয়ার মত মিলাইয়া যাইবে।

লিখিতে লাগিলাম।

ভাস্কর ঘরের ভিতর আসিয়া খাটিযাব উপরে বসিয়া পড়িল। সে পরিশ্রান্ত হইয়াছে। লোহা-লক্কড়ের কারখানায় সে আজ একটা কাজ যোগাড়করিয়াছে, তাহারই চিহ্ন তাহার পোযাকে, তাহার দেহে পরিস্ফুট।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বদ্ধ গলির ভিতব দিয়া দক্ষিণ সাগরের বায়ু পথ ভুলিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলি ইতিমধ্যে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। মহানগরীর বুকে ধোঁয়াটে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে।

ভাস্কর জামাটা খুলিল। সবল ও দৃঢ় মাংসপেশীগুলি তাহার সারা-দিনের পরিশ্রমে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, টন্‌টন্ করিতেছে।

কিছুক্ষন বসিয়া থাকিয়া সে মুখ হাত ধুইতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের উনুনে কাঠ দিয়া রান্না করিতে বসিল। কিন্তু হায়, কাঠ বারংবার নিভিয়া যায় ধোয়ার ঘর ভরিয়া উঠীল, তাহার দুই চক্ষু ফুলে লাল হইয়া উঠিল।

এমন সময় বহ্নি আসিয়া উকি মারিল, ভাস্করের রান্নার রকম দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুই লালচক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া ভাস্কর বলিল, "হাসছেন কেন ?'

"এমনি।"

"এমনি হাসা অন্যায়।"

"এমনি নয়, আপনার রান্না দেখে—"

"কেন ?"

"কেন এই অনধিকার চর্চ্চা—ও আপনার দ্বারা হবে না।"

"না হয় বাজারে যাব—দুপয়সার ছোলা না হয় তো যামিনীর হোটেলে চার পয়সার ডাল ভাত খেয়ে আস্‌ব—'

"আহা"—ভারী অদ্ভুত একটি মুখভঙ্গী করিয়া বহ্নি বলিল—"তাতে ভারী বাহাদুরী—"

"তবে কি করব ?'

"কি করবেন! আচ্ছা দেখাচ্ছি—'বলিয়াই সে উনুন হইতে মাটির হাড়িটি নামাইয়া লইয়া বালতীর জল আগুনে ঢালিয়া দিল।

ভাস্কর চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—"কি করলেন বলুন ত ?"

"কিছু না, আগুন নিভিয়ে দিলাম।"

"বাঃ রে—" ভাস্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বাজারে—"

"তবে একটু বসুন, মিনিট পাঁচেক, আমার কিছু আনাবার আছে।"

"বটে! বেশ বস্‌ছি।"

বহ্নি দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভাস্কর খাটিয়ায় বসিয়া পা নাচাইতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়,

পেটের ভিতরটা ক্ষুধার যন্ত্রণায় পাক খাইয়া উঠিতেই সে শুইয়া পড়িল। সেই কোন সকালে সে খাইয়া গিয়াছিল, আর কিছু পেটে পড়ে নাই, পেটের দোষ কি? বহ্নির উপর তাহার রাগ হইল। আগুন নিভাইয়া দিল কেন সে? সকালেও বহ্নি তাহার রান্না দেখিয়া অমনি হাসিয়াছিল। আবার আগুন জ্বালাইবে নাকি? না, হঠাৎ ভাস্কর মনের ভিতর রান্না না করার সুপ্ত ইচ্ছাটাকে আবিষ্কার করিল। যাক্ বহ্নি ভালই করিয়াছে—ও পোষাইবে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি এত দেরী করিতেছে কেন?

"আপনি খালি ছট্‌ফট্ করছেন কেন বলুন ত', ক্ষিদেটা ভয়ঙ্কর পেয়েছে বুঝি—"

ভাস্কর ফিরিয়া তাকাইল। বহ্নির একহাতে এক পেয়ালা চা, অপর হাতে একটি থালায় হালুয়া আর মুড়ী।

সে হাসিল—"না—মানে—হ্যাঁ—অল্প—"

"নিন্—তবে চট্ করে এবার বসুন দেখি, এগুলি শেষ করুন—"

ভাস্কর ইতস্ততঃ করে।

"বসুন—" বহ্নি বলিল।

"দেখুন বহ্নি দেবী, আমার লজ্জা করছে—'

"সে কি! লজ্জা ত মেয়েদের ভূষণ, ওতে আপনাদের মানাবে না—আপনারা নির্লজ্জই হোন—"

ভাস্কর হাসিল—"আচ্ছা বস্‌ছি, কিন্তু—"

"আর কিছু নেই, বুঝলেন?"

"হ্যাঁ—"

খাইতে খাইতে ভাস্কর বলিল—"আপনাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি বহ্নিদেবী—খাবার ভারী মিষ্টি হয়েছে—"

"ওঃ—বেশী চিনি দিয়েছি বুঝি ?"

"না-না—ঠাট্টা নয়—"

"তা হবে মেয়েদের হাতের জিনিষ সবই মিষ্টি তা জানেন না বুঝি ?"

"ওঃ—"

"আর দেখুন—রাত্রে এসে আমাদের ওখানেই ভাত খাবেন—"

"সে কি! না—না—ছিঃ—"

"ছিঃ কেন ?"

"আপনার বাবা—"

"বাবার কথা বাবা ভাববেন—আপনার কি খেতে ঘেন্না হয় ?"

"না—বাঃ—"ভাস্কর থতমত খায়। এ কেমন ধারা মেয়ে!

"কি ভাবছেন ?" বহ্নি প্রশ্ন করিল।

"তবে মাসে মাসে সংসার খরচে আমি কিছু দেব—"

সে যা হবার পরে হবে।

"বহ্নি দেবী—"

"দেখুন, আর আমায় দেবী আর, আপনি বলে ডাকবেন না—ওতে আমি খুশী হব না—"

"কিন্তু—"

"না—"

ভাস্কর চুপ করিল।

হাত মুখ ধুইয়া একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাস্কর বলিল—"কই বলুন—মানে বল কি আনতে হবে ?"

"কিছু না—"

"সে কি! এই যে বল্লে!"

"এম্‌নি—আমার ইচ্ছে।"

"বাঃ—"

"অবাক্ হবেন না—এখন যাবেন কোথায় বলুন ত—"

"বস্তীতে—রামচরণ মিস্ত্রীর ওখানে—"

"কেন ?"

"আজ সকলকে জড় হতে বলেছি—কাজ আছে—"

"কি কাজ ?"

ভাস্করের চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—"সে পরে বলব, এখনও সময় হয়নি বহ্নি—"

বহ্নি হাসিল।

ভাস্কর বাহির হইয়া গেল।

বহ্নি ভিতরে গেল।

বহ্নির মা বিমলা বলিল—"গেছে ছেলেটি ?"

"হ্যাঁ—"

ঘনশ্যাম হুঁকা টানিতেছিল, অর্দ্ধ-নিমিলিত নেত্রে বলিল—"মন্দ না ছেলেটা—"

বিমলা মাথা নাড়িল।

বহ্নি বলিল—"আজ থেকে ভাস্করবাবু আমাদের এখানেই খাবেন—

ঘনশ্যামের চোখ খুলিয়া গেল—"মানে ?"

"মানে—ভদ্রলোক রাঁধতে পারেন না—খাবার কষ্ট হবে তাই—"

"হেঁ হেঁ—তোর মাথা খারাপ হয়েছে—"ঘনশ্যামের মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল—"বলি—অপরকে খাওয়াবার মত আমার ক্ষমতা আছে ?"

"টাকা নেবে তার বদলে—" বহ্নি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল।

ঘনশ্যাম একটু নরম হইল—"হেঁ হেঁ—তা বেশ—তবু—"

"এর মধ্যে আর তবু নেই—বুঝলে ?"

"হ্যাঁ—"

আশ্চর্য্য মেয়ে এই বহ্নি—সকলেই তাহার বশ মানে।

টিনের একটি বড় ঘর। তাহার মধ্যস্থলে একটি ময়লা হ্যারিকেন ঝুলিতেছে, তাহার ম্লান আলোতে ঘরটা স্বল্পালোকিত। মেঝেতে কয়েকটি চাটাই বিছাইয়া জন কুড়ি লোক বসিয়া আছে, পরণে তাহাদের মলিন পোষাক, দেহে দারিদ্র্যের ছাপ। তাহাদের মাঝখানে ভাস্কর বসিয়া আছে।

চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ভাস্কর প্রশ্ন করিল— "আচ্ছা —যামিনী আসে নি ?"

হরিহর জবাব দিল—"না।"

"কেন ?"

"সে বলে—ওসব—সভা টভা আমার ভাল লাগে না—বেশ ত' নির্ঝঞ্ঝাটে আছি, আবার ওসব ঝামেলায় পড়ে পুলিশের নজরে পড়া কেন ?"

"তোমরা কি বল ? তোমাদেরও কি এটা ঝামেলা বলে মনে হয় ?"

কুড়ি জন লোকের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠিল, পরে রামচরণ মিস্ত্রী বলিল—"না—বাবু—"

"বাবু! কে বাবু ?"

"আপনি—"

"আমি ? ওসবের দিন গেছে, তোমরা আমার নাম কি জান না ?"

"জানি—"

"আমার নাম ধরেই আমায় ডেকো—আমি তোমাদের বন্ধু—"

"আচ্ছা—"

ভাস্কর উঠিয়া দাঁড়াইল—স্থিরভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"ভাইসব—যামিনী আসেনি বটে, কিন্তু পরে সে আসবেই, সে ভার আমার উপর রইল। যা ন্যায় তার পক্ষে সে না এসে পারবে না। হ্যাঁ, এবার আমার কথায় আসি—কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন করছি তোমাদের—জবাব দাও—"

রামচরণ বলিল—"বল—"

"আমরা কি বেঁচে আছি?"

কুড়িজন লোকের মধ্যে আবার গুঞ্জনধ্বনি উঠে, চাঞ্চল্য দেখা যায়, তাহাদের কালো কালো নিষ্প্রভ চক্ষে জিজ্ঞাসার চিহ্ন বঙ্কিম হইয়া উঠে।

হরিহর বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—বেঁচে ত আছিই।"

ভাস্কর হাসিল—"আমি বলছি—না।"

"কেন?"

"বাঁচা কাকে বলে জান?"

"না—"

"সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে সব কিছু ভোগ ক'রে ফুলের মত জীবনকে সুন্দর ক'রে, সকলকে সৌরভ দান ক'রে বাঁচাই আসল বাঁচা—আর সব মিথ্যা—মৃত্যুর সমান—"

ঘরের ভিতর গভীর স্তব্ধতা নামিয়া আসে। কুড়ি জন লোকের নিষ্প্রভ চোখে যেন আলো দেখা যাইতেছে।

ভাস্কর বলিতে লাগিল—"আমরা বেঁচে নেই। একে কি বাঁচা বলে? —এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনী আর দু'গ্রাস খাওয়া—এ ত জীবন নয়—এ মৃত্যু—"

ঘরের ভিতর দিয়া কয়েকটি ইঁদুর কিচির মিচির শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইয়া গেল।

"এই সুন্দর পৃথিবীতে যে সুন্দর জীবনের দরকার—তা আমরা ভুলে গিয়েছি, ভুলো না ভাই সব—আমাদের সুন্দর ভাবে বাঁচতে হবে—"

বাহিরে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে। ক্ষুধার্ত্ত কুকুর।

"দেখ, আমাদের হাত আছে, পা আছে, মানুষের মত সবই আছে কিন্তু তবুও আমরা মানুষ নই—আমাদের জীবন ত' কুকুরের জীবন—"

কুড়ি জন লোকের চোখে সূর্য্যোদয় ঘটিতেছে।

"কেন আমাদের এ অবস্থা? কয়েকটা মানুষের জন্য—আর আমরা তাদের ধমকে ভয় পাই বলে। ভাবো—কতভাবে আমরা অমানুষ—মানুষে মানুষে ভেদাভেদের উঁচু দেওয়াল খাড়া করে আমরা কুকুরের মত কেবল খাই দাই আর পরে একদিন মরি। আমাদের আশা কোথায় গেল?"

দূরে কাহাদের মত্তকণ্ঠের সঙ্গীত হইতেছে। ভোল, সব ভোল।

"আর বসে থাকলে চলবে না। মানুষের জীবনের শিরাতে যারা বিষ ঢেলেছে—তাদের বিরুদ্ধে এখন থেকে দল পাকাও ভাই সব, আমাদের সুন্দর জীবনকে যারা চুরি করেছে—তাদের এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে—"

ঘরের ভিতর তাহার উত্তেজিত বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর দেওয়ালের গায়ে প্রতিহত হয়, কুড়ি জন লোকের দেহে কষাঘাত হানে।

"ভাঙ্গতে হবে—যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানজনক—তাকে চুর চুর করতে হবে, এতে ভয় পেয়ো না। আজ থেকে তোমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকদিন যত লোককে পার—শোনাবে এই কথা। লোকদের বলো—এ পৃথিবীর ভার এবার আমাদের হাতে—দীনদুঃখী মানুষের হাতে—"

হ্যারিকেনের আলোটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

গর্জ্জন করিয়া ভাস্কর বলিল—"নিরাশ হয়ো না—সত্য আর ন্যায়

আগুনের মত। এখন হয়ত আমরা কয়েকজন আছি—কিন্তু আমি বলছি—কিছু দিনের মধ্যেই এ আগুন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। শুনে রাখ এ পৃথিবীকে আমরা বদলাব—"

কুড়ি জন লোকের চোখে উদিত সূর্য্যের স্নিগ্ধ অথচ তীব্র আলো ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এ পৃথিবী তাহাদের। তাহারা বদলাইবে এ পৃথিবী।

"বহ্নি"—ভাস্কর দরজার কড়া নাড়িল।

"কে ?"—বহ্নির কণ্ঠস্বর।

"আমি—"

" 'আমি' ত' সবাই—কিন্তু নাম কি ?"

"ভাস্কর—"

দরজা খুলিয়া বহ্নি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকারণে—নিতান্ত ছেলেমানুষের মত। ভাস্করের বেশ লাগে তাহা শুনিতে। সে তাহার দিকে চাহিল। বহ্নি একটি ঘোর রক্তবর্ণ সাড়ী পরিয়াছে, দুগ্ধশুভ্র দেহবর্ণ তাহাতে ঝক্ঝক্ করিতেছে, মাথার ঘন ও অজস্র চুলগুলি আলুলায়িত। দেখিতে দেখিতে ভাস্কর হঠাৎ যেন দেহের মধ্যে একটা নেশার মত অনুভব করে, ঘুম নয় অথচ ঘুমের মত একটা মোলায়েম ও মিষ্টি অনুভূতি যেন প্রতি স্নায়ুতে মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। সে ভাবে—রাত ত' খুব বেশি হয় নাই—অথচ ঘুম পায় কেন ?

"কি দেখছেন ?"—বহ্নি হাসি থামাইয়া প্রশ্ন করিল।

"তোমায়—বেশ দেখতে তুমি।"ভাস্কর হাত নাড়িয়া হাসিয়া বলিল।

বহ্নির গৌরবর্ণে প্রচ্ছন্ন অগ্নির আভা খেলিয়া গেল, সে মুখ ফিরাইয়া

বলিল—"বাইরে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ বক্তৃতা দেবেন বলুন ত'—ভেতরে চলুন—খাবার ঢাকা রয়েছে।"

"ঠিক-ঠিক—চল"—

ঘনশ্যাম বারান্দায় একটি মাদুর বিছাইয়া ঝিমাইতেছিল, ভাস্করের পায়ের আওয়াজে চোখ মেলিল।

"এই যে—কি খবর ?"

"ভালই—"

"কাজকর্ম্ম কি রকম চল্‌ছে ?"

"আজ্ঞে ভালই—"

"হ্যাঁ—একটা কথা—কয়েকজন লোক বলছিল—আপনি নাকি কি সব সভা সমিতি করে বেড়াচ্ছেন, সাবধানে করবেন—হেঁ হেঁ—আপনার ভালর জন্যই বল্‌ছি। জানেনই ত'—আজকাল পুলিশেরা যেন ওৎ পেতে রয়েছে—"

ভাস্কর হাসিল—"আমি অন্যায় কাজ ত' করি না, আমার কোন ভয় নেই—"

বহ্নি হাসিয়া বলিল—"ন্যায় অন্যায়ের কথা এখন থাক—নিন্ খেতে চলুন—"

"ঠিক ঠিক—যান ভাস্করবাবু—খেয়ে আসুন।"

"আমায় আর সকলের মত নাম ধরেই ডাকবেন, আমি বয়সে আপনার চেয়ে বড় নই—"

"হেঁ হেঁ আচ্ছা"—ঘনশ্যাম ভারী খুশী হইল। নাঃ, ছোকরা শ্রদ্ধা করে তাহাকে।

রান্নাঘরে গিয়া ভাস্কর বসিল। বহ্নি পরিবেশন করিতে লাগিল।

বহ্নির মা দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই আমার মাতা ঠাকুরাণী—" বহ্নি হাসিয়া বলিল।

"বটে! আপনিই—বেশ আপনাকে মাসী বলে ডাক্‌বো—"

বহ্নির মা হাসিল। বহ্নি নিজের রূপ মায়ের নিকট হইতেই পাইয়াছে—তবে বহ্নির মা একটু বেশী গম্ভীর।

"বেশ ত' বাবা—"

"এক মুঠো ভাত দিই?"

"না—না—আর নয়—"

"কেন! আজ বুঝি বক্তৃতা দিয়েই পেট ভরে গেছে?"

"হ্যাঁ—"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

"তোমার আর কে কে আছেন বাবা?"

ভাস্কর আমার দিকে চাহিল, "কি বলব? আমার কেউ আছে নাকি হে গ্রন্থকার?"

হাসিলাম—"যা ইচ্ছে তাই বল—তোমার কেউ নেই আবার সবই আছে—"

ভাস্কর বহ্নির মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"মা—ভাই—বোন—"

"বোনের বিয়ে হয়েছে?—"

"না…ওর বয়স ত' সবে বারো—"

"ভাইও বুঝি ছোট?"

"হ্যাঁ—"

"ওদের এখানে নিয়ে আস্‌বে না?"

"দেখা যাক্‌—"

খাওয়া শেষ হইতে থাকে। খাইতে খাইতে একবার ভাস্কর বহ্নির দিকে চাহিল। বহ্নির ললাটে দুই একটি ঘর্ম্মবিন্দু চক্‌চক্ করিতেছে—সে তাহার দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া আছে। ভাস্কর ভাবে বহ্নির দিকে চাহিলেই কি রকম যেন অদ্ভুত মনে হয়। কেন?

খাওয়া শেষ হইলে ঘরের ভিতর বসিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া ভাস্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবে। বাহিরে পরিষ্কার আকাশ চাঁদের আলোয় ভাসিয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ কাটে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন ঘনায় ভাস্করের চক্ষে।

হঠাৎ কাহার পদধ্বনি যেন বাহিরে শোনা যায়।

"কে?" ভাস্কর মুখ ফিরাইল।

কেহ উত্তর দিল না। পদধ্বনি থামিয়াছে।

ভাস্কর পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেল।

বারান্দায় কে যেন দাঁড়াইয়া।

"কে?" ভাস্কর অগ্রসর হইল।

"আমি—"

"বহ্নি?"

বহ্নি মাথা নাড়িল—একটু হাসিল। চন্দ্রালোকে সে হাসি অপার্থিব মনে হয়। মনে হয় বহ্নি যেন এই পৃথিবীর মেয়ে নয়—অনেক—অ-নে-ক দূরের কোনও এক অজ্ঞাত গ্রহের কুমারী মেয়ে, রহস্যময় বিদ্যুৎ তাহার চোখে—মদির হাসি তাহার ওষ্ঠে।

"কি ব্যাপার?" ভাস্কর প্রশ্ন করিল।

বহ্নি আবার পূর্ব্বের মত হাসিল,—"এম্‌নি, চাঁদের আলো দেখছি—আপনি এখনও ঘুমোন নি বুঝি?"

"না"—ভাস্কর হঠাৎ রোমাঞ্চকর অথচ অজ্ঞাত এক আনন্দ অনুভব করে। আঃ আকাশের চাঁদটা কি যেন বলিতেছে।

বহ্নি মাথা একটু নীচু করিয়া বলিল—"ভারী সুন্দর রাত্রি, না?"

ভাস্করের গলা কেন যেন শুষ্ক হইয়া আসে— হ্যা—"

বহ্নি মাথাটা হেলাইয়া একবার আড়নয়নে তীক্ষ্ণভাবে ভাস্করের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে ভাস্করের চেতনা অবশ হইয়া উঠে।

"যান শোনগে এবার—আমি চল্লাম"—বলিয়া—অনুচ্চ ও লঘু একটু হাসিয়া বহ্নি ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

হঠাৎ বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। একতারার তারের মত তাহার দেহটা কাহার অদৃশ্য আঘাতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দুইটি হইয়া উঠিল স্তিমিত ও স্বপ্নালস।

অস্ফুটকণ্ঠে সে একবার ডাকিল—"বহ্নি—বহ্নি—" কোনও উত্তর আসিল না। বহ্নির পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেছে। আঃ—আকাশের চাঁদটা কি যেন বলিতেছে।

থামিলাম। একি হইল!

ডাকিলাম—"ভাস্কর—"

ভাস্কর কোনও উত্তর দিল না।

তাহার কাঁধে হাত দিয়া ঝাঁকুনী দিলাম—"ভাস্কর—"

ভাস্করের মন যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, চমকিয়া উঠিয়া সে আমার দিকে চাহিল। একটু হাসিয়া বলিল—"আমায় ডাকছেন?—"

"হ্যাঁ—"

"কেন ?"

"ভাস্কর—সাবধান—"

সে বিস্মিত হইল' "কেন—কি করেছি আমি !—"

গভীর দুঃখের সহিত বলিলাম, "প্রেমে পড়ো না ভাস্কর—"

সে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"প্রেম ! সে কি জিনিষ ?"

যাক—এখনও সে জানে না প্রেম কি। একটু আশ্বস্ত হইলাম। না, আর তাহাকে বক্তির সান্নিধ্যে লইয়া যাইব না।

সে আবার প্রশ্ন করিল, "বলুন না প্রেম কি ?"

নিজের দুঃখের কথা, দেবীর কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম—"প্রেম কি ? প্রেম একটা ব্যাধি—বলিষ্ঠ হৃদয়কে তা দুর্ব্বল করে তোলে, জীবনের ওপর আনে বিরাগ আর বিস্বাদ। ও মানুষের শত্রু। সাবধান ভাস্কর—কোনও দিন প্রেমে পড়ো না, দূরে পরিহার করো এ বিপদকে—"

"কেমন করে বুঝবো যে প্রেমে পড়ছি ?"

তাহার এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাই না। মানুষ ত কখনও বুঝিতে পারে না যে সে প্রেমে পড়িতেছে, কেবল হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে সে আবিষ্কার করে যে তাহার হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে প্রেম তাহার বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, আর কিছুই নয়।

বলিলাম—"পরে বলব সে কথা, আজ তুমি ঘুমোতে যাও—"

মাথা নাড়িয়া ভাস্কর বলিল—"আচ্ছা—"

কিন্তু হায়, সেদিন ভাস্কর ঘুমাইল না। নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া বাহিরের চন্দ্রালোকিত আকাশে কাহার একটি সুগৌরব মুখচ্ছবি সে যেন বারংবার তাহার কল্পনার সাহায্যে আঁকিতে লাগিল। বাধা আর দিলাম না দিলেই সে হয়ত আবার প্রশ্ন করিবে—প্রেম কি ? বুঝাইলেও সে বুঝিবে না—প্রেম যে অন্ধ।

কেবল প্রেমের দেবতাকে একবার বলিলাম—"হে দুরন্ত, আমার সৃষ্টি ব্যর্থ করো না, ব্যর্থ করো না—"

প্রেমের দেবতা হাসিয়া বলিল—"লেখক—আমি নিরুপায়, কারণ আমার দেবত্ব ত' এই খানেই। কিন্তু তুমি দুঃখ করো না, তোমার সৃষ্টি এতে সার্থক হবে।"

অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িলাম।

রাত অনেক গভীর হইয়াছে। পৃথিবী কি নিস্তব্ধ! গভীর শান্তির অদৃশ্য স্রোতধারা বহিয়া চলিয়াছে শূন্য পথ বাহিয়া। দেবী, বিলাৎ ফেরৎ, ১০ই বৈশাখ, আর এই ব্যর্থ যুগ। ঈশ্বর তুমি কি আছ?

সকালে উঠিয়া দেখিলাম—মায়ের জ্বর হইয়াছে। সারা দেহে অসহ্য বেদনা।

"ও কিছু না, দু'দিনেই সেরে যাবে"—মা হাসিয়া বলিলেন।

মন মানিল না। মুখ হাত ধুইয়া ছুটিলাম ডাক্তারের ওখানে। কিন্তু পকেটে একটি পয়সাও নাই।

অনেকক্ষণ বসিবার পর রমেশের সহিত দেখা হইল। সে আমার বাল্যবন্ধু আজকাল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করে। এই অল্পবয়সেই তাহার মন্দ পসার হয় নাই।

"কিরে—কি খবর?" সে বলিল।

'ভাই, মায়ের আজকে জ্বর, গায়ে ব্যথাও আছে—"

"হুঁ—আজকাল দিন ভাল নয়, বসন্ত খুব হচ্ছে—আচ্ছা দিচ্ছি ওষুধ—"

একটি কাগজে ঔষধটি দিয়া সে বলিল—"এখুনি গিয়ে খাইয়ে দে—" উঠিতেছিলাম সে আবার বলিল—"দামটা—"

হাসিয়া বলিলাম—"ঠাট্টা করছিস?"

সে মুখ গম্ভীর করিল—"ব্যবসায় ঠাট্টা কি ভাই, সকলকে বিনি পয়সায় ওষুধ দেব কি করে ?"

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু উপায় নাই, পকেট শূন্য।

ম্লান হাসিয়া বলিলাম—"ত্'দিন পরে পয়সাটা দিয়ে দেব, কিছু মনে করিস না ভাই—"

সে কিছু বলিল না। চলিয়া আসিলাম। মনে মনে শুধু বলিলাম—এই হয়।

সাড়ে ন'টায় অফিসে পৌছাইলাম। স্তূপীকৃত প্রুফ আসিয়াছে, তাহা দেখিতে লাগিলাম।

ভিতরে মেসিন চলিতেছে। ধ্বক্ ধ্বক্-খটাস্—ধ্বক্‌ধ্বক্-খটাস্—একটানা আওয়াজ।

একপাশে বসিয়া বোবা হরিনাথ ছোলা চিবাইতেছে। হঠাৎ তাহার নজর পড়িল একটি অৰ্দ্ধনগ্না নারীর ছবির উপরে। ছবিটি এই মাসের কাগজে যাইবে। সে ছবিটি হাতে লইয়া মুগ্ধনয়নে দেখিতে লাগিল।

কানাই প্রশ্ন করিল—"কি দেখছিস্ রে শালা ?"

বোবা তাহার পানের ছোপ লাগানো দাঁত মেলিয়া হাসিয়া বলিল—"অ্যাঁ—"

"কে এ মেয়েটা বল্‌ত ?"—কানাই হাসিয়া বলিল।

"এ্যাঁ-আঃ-আঁ—হা হা হা"—বোবা বলিল যে ছবিটি তাহার বৌয়ের।

সমস্ত কর্ম্মচারীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বোবাও হাসিতে লাগিল। তাহার গলদেশের শিরাগুলি হাস্যাবেগে ফুলিয়া উঠিল।

এমন সময় কানে আসে ভাস্করের গলা। সকলের হাসির মাঝখানে

আসিয়া সে যেন বলিতেছে—"ভাই সব, আমাদের দিন আসছে—তৈরী হও, আর এসব বাজে কথা নয়, মিথ্যে হাসি নয়, এবার আমাদের যাত্রা সুরু হবে—"

আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মেসিনটা চলিতেছে। ধ্বক্-ধ্বক্-খটাস্—ধ্বক্-ধ্বক্—খটাস্—

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিয়া দেখি মায়ের জ্বর আরও বাড়িয়াছে, শরীরের ব্যথাও কমে নাই। শোভা বেচারী একা একা কাজ করিতেছে।

মায়ের নিকট গিয়া বসিলাম। মা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিঃসাড়ের মত পড়িয়া আছেন।

"মা—"

"কে ?"

"আমি।"

"ওঃ—খোকা—"

"এখন কেমন আছ ?"

"শরীরের ব্যথাটা বেড়েছে—ও কমে যাবে, তুই ভাবিস্ নি বাবা—"

চুপ করিয়াই থাকি—কি বলিব ?

"খোকা—"

"কি মা ?"

"এবার একটা বিয়ে কর তুই। আমার আর বেশী দিন নেই—মনে হচ্ছে আর বাঁচব না। তোর বৌ দেখতে পেলে আমার মনের দুঃখ খানিকটা কমত—"

"মা, তুমি চুপ কর, ওসব কথা পরে হবে—"

"না খোকা—এবার তুই মত দে—"

বিবাহ। বৈশাখ মাস। দেবী। বিলাত ফেরত।

"মা—তুমি আগে সেরে ওঠ।"

নিজের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ভাবি—জীবনে কি করিলাম। কিছুই না। কত আশা, কত বিচিত্র কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়াছিলাম—সবই ধূলিসাৎ হইয়াছে—সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতেছে। মুমূর্ষু আলোর কান্না শুনি।

এমন সময় আসিল গৌরী। তাহার সহিত আসিল আমার ঘরের মধ্যে অজস্র জীবনের তরঙ্গ—আসিল বিস্মৃত বসন্তের আনন্দ।

একগাল হাসিয়া গৌরী বলিল, "মেজদা গো—"

"কি ভাই?"

"তুমি কি সব সময়েই ভাব্‌বে?"

"গৌরী—এ পৃথিবী বড় জটিলতায় পূর্ণ—তা বুঝতে পেরেছি বলেই ভাবি।"

"সত্যি—অত ভেবো না—"

"তোমার কথা মনে রাখব।"

হঠাৎ আঁচল হইতে একরাশ বেলফুল বাহির করিয়া গৌরী বলিল—

"তোমার জন্য ফুল এনেছি মেজদা, নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে—না?"

ফুল! লাল ফুল। দেবী। সে ফুল ফেলিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এ ফুল ফেলিবার সাধ্য কোথায়?

দুই হাত বাড়াইয়া হাসিয়া বলিলাম—"দাও বোন।"

শুভ্র ফুলগুলির আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া চোখে জল আসে। গৌরীর দিকে চাহি। স্মিতহাস্যে সস্নেহ নয়নে সে আমার দিকে চাহিয়া আছে।

মেয়ে জাতটা অদ্ভুত। ইহারা যেমন আঘাত দিতে পারে, তেমনি ভালবাসিতেও পারে।

"গৌরী, তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে?"

গৌরী মিষ্টি হাসিয়া বলিল—"এ জন্মে যা—তাই ভাই—"

তাহার দিকে চাহিয়া ভাবি যে যদি ইহারা না থাকিত তবে জীবন কি দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিত।

শোভা আসিয়া একবার উঁকি মারিল।

গৌরী হাসিয়া বলিল, "কি রে মুখপুড়ী, তোর রান্না হল?"

"না।"

"তুই কি রকম মেয়ে রে শুভী—মেজদার জন্য আয় একটা মেয়ে ঠিকঠাক করি—বেচারী কেমন মুষড়ে গেছে দেখ—"

হাসিলাম। দেবী।

শোভা চক্ষু বড় করিয়া বলিল—"মেজদার বিয়ে! ওরে বাঁপ! আমাদের সে সৌভাগ্য হবে না, থাক ও সব কথা—তুই রান্নাঘরে চল—"

তাহারা চলিয়া গেল।

বেলফুলের গন্ধে সমস্ত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। আকাশে নক্ষত্রের মালা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, গাছের পাতাগুলি স্থির হইয়া আছে, বাতাস নাই।

শূন্যমনে বাহিরের দিকে চাহিয়া সময় কাটাই।

কিন্তু ধীরে ধীরে মস্তিষ্কটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। মনের অন্তরালে আর একটা যেমন আছে—সেখানে ঝড় উঠিয়াছে।

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনের ভিতরে কে যেন আমাকে উত্তেজিত করিতেছে।

বাড়ী হইতে বাহির হইলাম।

দেবীর বাড়ীতে পৌঁছাইলাম।

যন্ত্রচালিতের মত দেবীর বাবার ঘরে ঢুকিলাম। তিনি বসিয়া অফিসের কাগজপত্তর দেখিতেছিলেন।

আমাকে দেখিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, "বোস, কি খবর?"

নিদ্রাঘোরে যেমন মানুষ কথা বলে তেমনিভাবে বলিলাম, "একটা জরুরী কথা আছে।"

"কি কথা?"

একটু থামিলাম। পরিপূর্ণভাবে নিঃশ্বাসের সহিত বাতাস টানিয়া লইয়া হঠাৎ বলিলাম, "দেবীকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

"কি বল্লে?" তাঁহার চোখে আর পলক পড়ে না, বিস্ময়ে তিনি চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আর কিছু বলিলাম না। নিশ্চলভাবে ও নিঃশব্দে তাঁহার মন্তব্য শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

কক্ষের ভিতর পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি অপেক্ষা করি। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ না আর কিছু—

দেবীর বাবা অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে হাসিলেন—"তুমি পাগল নবেন্দু।"

পাগল! সবাই আমাকে তাই বলে। দেবী বলে, গৌরী বলে মা বলেন—

মনের অরণ্যে দাবানল জ্বলিয়াছে। উঃ, কি জ্বালা!

দেবীর বাবা বলিয়া চলিলেন, "দেখ, সংসারে মানুষ সুখটাই বেশী চায়, একথা তুমি সাহিত্যিক, তোমায় তাই বোঝাতে চেষ্টা করব না। আমার মেয়ে যাতে সর্ব্বপ্রকারে সুখে থাকে সে চেষ্টা আমি করবই। আচ্ছা সত্যি করে বল দেখি—তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিলে সেটা হবে কিনা?

তাছাড়া দেবীর সঙ্গে অনিলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সেটা নিশ্চয় জানো—আর তাঁকে দেবী ভালওবাসে।"

ভূমিকম্পে বড় বড় অট্টালিকাকে মুহূর্ত্তে ধূলিকণায় পরিণত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে আকাশচুম্বী সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহা যে তেমনিভাবে চূর্ণ হইয়া যাইবে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই।

"আমার মনে হচ্ছে তোমার শরীরটা খারাপ, বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে থাকগে বাবা।"

দেবীর বাবা সহৃদয় ও উদার প্রাণ।

নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইলাম। চোখের সামনে একটা কালো পরদার উপর আগুনের ফুল্কী ফুটিয়া উঠিতেছে।

বাহিরে মোটর থামিল। ঝক্‌ঝকে মোটর।

মোটর হইতে বাহির হইয়া আসিল দেবী, অনিল মিত্র ও আরও দুইটি অপরিচিতা তরুণী। তাহাদের কলহাস্যে আমার চমক ভাঙ্গিল।

দেবী হঠাৎ আমাকে দেখিয়া বলিল—"কখন এলে ?"

উত্তর দিতে পারি না। তাহাকে দেখি। দেবী কত সুন্দর ?

অনিল মিত্র বলিল—"ইনিই বুঝি নবেন্দুবাবু ? নমস্কার !"

যন্ত্রচালিতের মত প্রত্যভিবাদন করিলাম।

"আপনার কয়েকটা গল্প পড়েছি, সত্যি আপনার লেখার ক্ষমতা আছে—"

শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম "ধন্যবাদ।"

দেবী বলিল "চল ভেতরে, বস্‌বে না ?"

অনিল মিত্রও অনুযোগ করিল—"আসুন না একটু গল্প করি—"

ম্লান হাসিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে না—মাফ করবেন, আজ আমার একটু কাজ আছে, অন্যদিন বরঞ্চ আপনার সঙ্গে গল্প হবে—তাছাড়া গল্প করার চেয়ে গল্প লিখ্‌তেই আমি বেশী ভাল পারি—"

"কি জন্য এসেছিলে বল ত ?" দেবী প্রশ্ন করিল, অনিল মিত্রকে বাঁচাইল।

তাহার দিকে চাহিলাম। আমার দুই চোখে বোধ হয় একটা বন্য হিংস্রতা ফুটিয়া উঠিল, তাই দেবী দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

বলিলাম—"এম্‌নি—একটু দরকার ছিল—"

"ওঃ"—সে যেন আমার কথা বিশ্বাস করিল না, পরে হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় বলিল—"শুনলাম মাসীমার নাকি জ্বর ?"

"হ্যাঁ, আচ্ছা চলি—নমস্কার মিঃ মিত্র—"

"নমস্কার—"

আমি দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিলাম। রাজ-কন্যার মত অপরূপ, গর্ব্বোন্নতা, রূপসী দেবী ভিতরে চলিয়া গেল, সঙ্গে গেল আর সকলে। আর রাজকন্যার প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষুকের মত খানিকক্ষণ আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার ভিক্ষাপাত্রে উত্তপ্ত ভস্মস্তূপ, আর কিছু নয়। ভিতর হইতে দেবীর হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল লঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের মত তাহা বাতাসে মিলাইয়া যায়। দুই একটা অস্পষ্ট, সূত্রহীন কথার টুকরাও শুনিতে পাই। কণ্ঠস্বরে তাহার মোলায়েম একটা অনুভূতি, সঙ্গীতের মত মিষ্ট ঝঙ্কার আর মাদকতা। দেবী অনিল মিত্রকে ভালবাসিয়াছে !

আকাশের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করি—ঈশ্বর, তুমি কি আছ ?

কোনও উত্তর পাই না।

মিট্‌মিটে হ্যারিকেনের আলোতে আলোকিত ঘরের মধ্যে একশ জন লোকের মাঝে দাঁড়াইয়া ভাস্কর বলিতেছিল, "ঈশ্বরের বিষয়ে এখন আমাদের ভাবার দরকার নেই, কারণ আমাদের অবস্থা ত আমাদের

হাতে। ভাই সব—আর নয়, আমাদের জীবনের অন্ধকারকে দূর করতে হবে, প্রদীপের আলো নয়, সূর্য্যের আলো চায় আমাদের জীবনে—”

একশ জন লোকেরা উত্তেজিতকণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, “হ্যাঁ—সূর্য্যের আলো চাই আমাদের জীবনে—”

সূর্য্য কই ?

ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া সময় কাটাই। সময় কাটে। ক্রমে রাত নিশুতি হয়, গাছপালার আড়ালে এককালি শীর্ণকায় চাঁদ অস্ত যায়, অন্ধকার গভীর হয় এবং নিঃশব্দ কক্ষে পাথরের মত বসিয়া বসিয়া মহাকালের পদধ্বনি শুনিতে থাকি। বাহিরের দিকে চাহি। দুঃখ হয়। পৃথিবী পুরাতন হইয়া গিয়াছে, মানুষ পুরাতন হইয়া গিয়াছে। বহু পুরাতন কীটদষ্ট কাঠের মত তাহার অন্তরের শক্তি, সৌন্দর্য্য সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বদ্‌লাইতে হইবে। নূতন পৃথিবী আর নূতন মানুষকে সৃষ্টি করিতে হইবে। ভাঙ্গুক এ পুরাতন পৃথিবী, ধ্বংস হউক এই যুগের মানুষ, ইতিহাস লুপ্ত হউক। আর এবার মৃত ইতিবৃত্ত নয়, এবার রচিত হইবে নূতন মানুষের জীবনকাব্য। তাহাতে নাই কোন তারিখ, থাকিবে শুধু গভীর অনুভূতির মধুচ্ছন্দ। দেবী। নানা কথা ভাবিতেছি, কিন্তু তাহার মধ্যে সমুদ্রের অতল হইতে উত্থিত বুদ্বুদের মত, নিয়তির নির্ম্মম কষাঘাতের মত, একটি গর্ব্বিতা, হৃদয়হীনা রমণীর কথা কেন মনে পড়ে ?

ঘুম আসে না, লিখিতেও ভাল লাগে না, নিঃশব্দতার অতলে ডুব দিয়া, বিরাট একাকীত্বের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করিয়া জীবনের হিসাব কষি। এককালে সবই ছিল, ধনী পিতা ছিল, খ্যাতি ছিল, প্রতিপত্তিও ছিল। কিন্তু জীবনেও প্রাকৃতিক ঝড়ের মত ঝড় ওঠে, একদিন তাহা

উঠায় পিতার মৃত্যুর সহিত সব গেল—আমরা দরিদ্র হইলাম। তাই আজ দেবীও—। আচ্ছা এ পৃথিবীতে ভালবাসার মাপকাঠিও কি অর্থ? উত্তর নাই। আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর নাই।

যা ভয় করেছিলাম, তাহাই হইয়াছে দুইদিন পরে মায়ের সর্ব্বাঙ্গ বসন্তের গুটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দিন কয়েক কাটিল। গুরুভার আকাশ আমার মাথায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মায়ের অবস্থা খারাপ হইল। যন্ত্রণায় তিনি দিনরাত কেবল অস্ফুট আর্ত্তনাদ করেন, গুটিকায় তাহার চক্ষু পর্য্যন্ত বন্ধ। শোভা কেবল কাঁদে, রান্না বন্ধ। এই সময়ে গৌরী আর তার মা আসিয়া খাবার দিয়া যায়, সাহায্য করে, বিষাক্ত ব্যাধি বলিয়া দূরে সরিয়া যায় না। এরাও মানুষ। আর শশী ডাক্তারকে ডাকিতে গিয়া অর্থ দিতে না পারায় প্রত্যাখ্যাত হই। শশীও মানুষ। মানুষে মানুষে এত পার্থক্য কেন?

মাস শেষ হইল কিন্তু মাহিনা পাই নাই! তবুও কোনও রকমে অফিসে যাই, কিন্তু ঠিকমত কাজ করিতে পারি না, মনটা বিক্ষিপ্ত থাকে। ম্যানেজার তাড়া দেয়।

যোগেশদা খবর পাইয়া একদিন আসিলেন, আমায় আড়ালে ডাকিয়া পাঁচটা টাকা হাতে গুজিয়া দিয়া বলিলেন, "মায়ের জন্য দিলাম, দরকার হলে পরে আরও নিস্—"

কৃতজ্ঞতায় শুধু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"যোগেশদা—"

যোগেশদা তিরস্কার করিলেন—"নে কাব্যি করিস না, আমার আছে তাই দিলাম, না থাকলে কোন শালা দেয়—"

যোগেশদা খানিকপরে চলিয়া গেলেন।

গৌরী শোভার সহিত ঘরে বসিয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ লজ্জিত হই, রোগীর ঘরে তাহার অত থাকা উচিত নয় ব্যাধিটা যে সংক্রামক।

বলিলাম—“গৌরী—ভাই বাড়ী যাও।”

“কেন মেজদা?”

“এত এখানে থেকো না—একটু সাবধান হওয়া উচিত।”

গৌরী মৃদু হাসিল—“মেজদা—তুমি ভারী পরের মত কথা বল—আমার মায়ের যদি অসুখ হয় তবে কি তাঁকে শুশ্রূষা করব না? মাসীমা আর মায়েতে তফাৎ কোথায়?”

যে ঈশ্বরকে মানি না—হঠাৎ তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতে ইচ্ছা করে: মানুষের রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষা আত্মার সম্বন্ধ অনেক বড়।

দুই দিন পরে মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হইল। গুটিকাগুলি ফাটিতে আরম্ভ করিল, ঘরে একটা পীড়াদায়ক দুর্গন্ধ। মায়ের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে।

অফিস যাওয়া বন্ধ করিলাম।

হঠাৎ সেদিন রাত্রে আমার কক্ষে আসিল বসন্তের আত্মা, আসিল কোকিলের সঙ্গীত, আসিল নভচ্যুত চাঁদ। দেবী। সঙ্গে তাহার মা। রোগীর ঘরের ভিতর তাহাদের ঢুকিতে দিলাম না, নিজের ঘরে বসাইলাম। মা নিঃঝুমের মত পড়িয়া ছিলেন—দেবীর মা তাঁহাকে উকি মারিয়া দেখিতে গেলেন।

দেবীর সহিত কক্ষে আমি একলা। কোনও কথা খুজিয়া পাই না—মস্তিষ্ক একেবারে শূন্য, কেবল হৃদয়ে একটা গুরুভার বেদনা যেন জমাট হইয়া উঠিতেছে। একবার উদ্‌ভ্রান্তের মত শুধু দেবীর দিকে চাহিলাম—

দেখিলাম সেও আমার দিকে চাহিয়া আছে। মাথা নীচু করিলাম। হঠাৎ সমস্ত কক্ষ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, মধুলুব্ধ ভ্রমরের গুঞ্জনের মত মধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিল—"সেদিন তুমি বাবার কাছে বিয়ের কথা বল্‌তে গিয়েছিলে বুঝি?"

মাথা নাড়িলাম।

"কেন?"

"এ প্রশ্ন অর্থহীন দেবী—তুমি জান আমি তোমায় ভালবাসি—"

দেবী জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"কেন নিজেকে অত নীচু করলে?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলাম—"তুমি ত' জান আমার শ্রেষ্ঠ কাম্য তুমি—তোমার জন্য দাসত্ব স্বীকার করতে পারি—"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"কিন্তু আমার এবার বিয়ে হবে সে কথাটা ভুলো না—"

হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া বলিলাম, "ভুলব! সব ভুলব কিন্তু এটা ভুলব না যে তোমার বিয়ে হবে—তুমি আমার হবে না, অন্যের হবে—"

তাহার মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু চোখে যেন অদ্ভুত একটা করুণতা ঘনাইয়া আসিল, মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"তোমার দুঃখ আমি বুঝি, কিন্তু কি করব।—তবু তুমি জেনে রেখো যে শ্রদ্ধা করি তোমাকেই সবচেয়ে বেশী—"

সহ্য করিতে পারিলাম না, নাটকীয় ভঙ্গীতে উঠিয়া করজোড়ে হঠাৎ শ্লেষতিক্তকণ্ঠে বলিলাম—"হে দেবী—আপনার অনুগ্রহকে শতসহস্র ধন্যবাদ।"

তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমার আঘাত সে বুঝিয়াছে।

নিষ্ঠুরতার আনন্দে খুশী হইয়া উঠিলাম। হৃদ্‌পিণ্ডটা সজোরে চলিতেছে। চোখে একটা জ্বালা।

"চল্লাম বাবা"—দেবীর মা আসিলেন। মায়ের বিকৃত আকৃতি দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়াছেন বোঝা গেল। স্বাভাবিক!

"চল্‌রে দেবী"—তিনি ডাকিলেন।

"চল মা—"

দেবীর মা অগ্রসর হইলেন।

দেবীও অগ্রসর হইল, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, মুহূর্ত্তকাল তাহার দৃষ্টির গভীরতায় আমাকে আচ্ছন্ন ও মুহ্যমান করিয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"যতই ব্যঙ্গ কর না কেন—তবুও আমার কথা-গুলো বিশ্বাস করো।"

দেবীর দিকে চাহিলাম। চিতাবাঘের ছায়ার মত কালো তাহার সুদীর্ঘ কেশরাশি—প্রশস্ত ললাটের নীচে বাজপাখীর ডানার মত দুইটি বাঁকা ভ্রূ—আর তাহার নীচে দুইটি চোখ—চোখ ত' নয় যেন দুই ফালি আধঘুমন্তচাঁদ।

সে চলিয়া গেল। হায়, চাঁদ অস্ত গেল।

একা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ হাসি। প্রেম একটা ব্যাধি। পাশের ঘরে মা মৃত্যুশয্যায়—আর এ ঘরে আমি প্রেমের কত কথা বলিয়া অভিমান করিলাম! কিন্তু এই ত' হয়। মৃত্যুর মত জীবনও সত্য, যৌবনও সত্য—তাহাদের ধর্ম্মকে উপেক্ষা করি কি করিয়া?

আর দুইদিন পরে একদিন রাত্রিবেলায় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল—মা মারা গেলেন।

যোগেশদাকে খবর দেওয়ায় তিনি জন পাঁচেক লোক লইয়া

আসিলেন। মাঝরাত্রিতে সুপ্ত নগরীর নির্জ্জন পথ দিয়া মৃত্যুর জয়ধ্বনি করিয়া শ্মশানে গেলাম।

ক্ষণপরে মায়ের বিকৃত, স্ফীতকায় দেহটা পুড়িতে আরম্ভ করিল। দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে চোখের সামনে আর একটা দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। একজন জীবন্ত লোক পুড়িতেছে। লোলুপ লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝে লোকটি পুড়িতেছে—তাহার জ্বলন্ত গলিত মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। তবুও তাহার মুখমণ্ডলে কষ্টের কোনও চিহ্ন পরিস্ফুট নহে, তবুও চতুঃপার্শ্বস্থ অগ্নিশিখাকে সে বলিতেছে—হে সুন্দরী বহ্নিশিখা—পতঙ্গের মত তুমি আমাকে দগ্ধ কর—আরও দগ্ধ কর। সে আমি।

একমাস কাটিয়া গিয়াছে। মায়ের শ্রাদ্ধ কাল হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে আমি এখন একা। মায়ের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া শঙ্কর (শোভার স্বামী) আসিয়া শোভাকে লইয়া গিয়াছে। হ্যাঁ, যাওয়ার সময় শোভা কাঁদিয়াছিল, মায়ের মৃত্যুর কথা, আমার একাকীত্বের কথা স্মরণ করিয়া সে কাঁদিয়াছিল, চিরন্তন নারীর বিবাহপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ আমাকে বলিয়াছিল, "দাদা, তুমি একা কি করে থাকবে—একটা বিয়ে এবার করো।"

হাসিয়া বলিয়াছিলাম, "নিজের চরকায় তেল দে ভাই—আমার ওসব দরকার নেই।"

সে বলিয়াছিল—"মায়ের শেষ ইচ্ছাও তাই ছিল—জানো?"

বলিয়াছিলাম—"মায়ের ইচ্ছা ত' পূরণ করেছি রে, আমি একজনকে বিয়ে করেছি—"

শোভা অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল—"হেঁয়ালী করে কথা বলা কবে ছাড়বে?"

উত্তরে বলিয়াছিলাম—"মরলে পরে।"

তারপরে শোভা চলিয়া গিয়াছে। যাওয়ার সময় মনে একটা ব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম। আমি মানুষ, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও দুর্ব্বলতা আমার রক্তে আছে, তাই একটু বেদনা বোধ করিয়াছিলাম বৈকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের অন্তরালে একটা বন্ধনমুক্তির তীব্র আনন্দও অনুভব করিয়াছিলাম, মনের মধ্যে যে যাযাবর বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে সে খুশী হইয়া বলিয়াছিল—"এই ভাল এবার পাড়ি দেওয়ার পালা—যত বাঁধন সব ছিঁড়ুক—।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাসিয়াছিলামও। সব বন্ধন ছিঁড়িবে কিন্তু একটা বন্ধন কোনও দিন কোনও কিছুতে ছিঁড়িবে না। সে দেবী।

এই একমাসে আমার পারিপার্শ্বিক বদলাইয়াছে। গৌরীদের বাড়ীতে আজকাল খাই, অফিস যাই আর শূন্যমনে সময় কাটাই। গৌরীর বাবা আর মা নানাভাবে কত সাহায্য যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবুও তাহাদের বাড়ীতে খাইতে লজ্জা বোধ হয়, কেন জানি না। গৌরী সেটা বুঝিয়া একদিন বলিয়াছিল, "মেজদা তুমি অনেক দুঃখ পাবে।"

"কেন ভাই?"

"তুমি আপনজনদের পর ভাব।"

এই একমাসে আর একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে—আমার মনের মধ্যে একটা নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্যের একটা উদাসীন ভাব ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছে। আসল কারণ তাহার জানি—তবুও দমন করিবার উপায় নাই।

"মেজদা—

গৌরী আসিল।

"মেজদা, তোমার কি খেয়াল নেই যে দশটা বাজতে চল্ল?"

হাসিলাম। খেয়াল নাই সত্যই। দেবীর কথাটা আজ বারংবার

মনে পড়ে। কতদিন তাহাকে দেখিনা। মা মারা যাওয়ার পরদিন একবার আসিয়াছিল, নিঃশব্দে খানিকক্ষণ বসিয়া চক্ষু মুছিয়া সেই যে চলিয়া গিয়াছিল তাহার পর আর তাহাকে দেখি নাই। কাল মায়ের শ্রাদ্ধ হইল, ভাবিয়াছিলাম সে তাহার মায়ের সহিত আসিবে, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। তাহাদের বাড়ীতে গিয়া ত' অনায়াসে তাহাকে দেখিয়া আসিতে পারি, কিন্তু কোথায় যেন মনের ভিতর একটা ভাঙ্গন ধরিয়াছে—সে স্পৃহা হয় না। একটা আলস্যও যেন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে—এই একমাস কলম ধরি নাই। নিঃশব্দে বসিয়া শুধু অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত জ্বলিতেছি।

"ও মেজদা—চল—খাবে না?"

"হ্যাঁ—চল বোন।"

উঠিলাম। ভাবি—আমি শিল্পী—ব্যক্তিগত জগৎ ছাড়া আর একটা জগৎ আমার আছে—সেটাকে অস্বীকার করিলে, ভুলিলে ত' আমার চলিবে না। না, আজ আবার লিখিতে বসিব। আমার যত ব্যর্থতা—তাহা সফল করিবে আমার অতিমানব নায়ক।

দরজার তালা বন্ধ করিয়া চলিলাম।

খাইবার সময় গৌরীর মা বলিলেন, "দেবীর বিয়ে ত ঘনিয়ে এল বাবা —আর দিন কুড়ি মাত্র।"

মুখের গ্রাস পড়িয়া গেল। সত্যই ত আজ ২১শে চৈত্র। ধীরে ধীরে সমস্ত দেহের ভিতরটা শীতল হইয়া আসে। আমি কি মরিতেছি?

ধ্বক্ ধ্বক্ খটাস—মেসিনটা চলিতেছে। দ্বিপ্রহর অপরাহ্নের দিকে পদক্ষেপ করিতেছে। প্রেসের মালিক ও 'দিগন্ত' পত্রিকার সম্পাদক নরেন বাবু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"নবেন্দু বাবু—একটা কথা আছে।"

"বলুন—"

"দেখুন—আপনি অনেকদিন ধরে কাজ করছেন এবং ভালভাবেই করছেন তবু—কিছু মনে করবেন না—আপনাকে আমার জবাব দিতে হচ্ছে—"

ব্যাপারটা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অসহায়ের মত কেবল চাহিয়া থাকি।

নরেনবাবু আমাকে বোঝাইতে লাগিলেন, "বুঝতেই পার্চ্ছেন, প্রেস আর কাগজ থেকে তেমন লাভ আর হচ্ছে না, সময় বড় মন্দ, তাই ভাবছি আমি নিজেই চালিয়ে নেব। আপনি আজ কাজ করুন, যাওয়ার সময় আপনার টাকা নিয়ে যাবেন।

নরেনবাবু চলিয়া গেলেন। হ্যাঁ—আমার চাকুরী গিয়াছে। পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতর রামলাল প্রবেশ করিল, সে কম্পোজিটার।

"বাবু—"

"কি ?"

"কর্তা বুঝি জবাব দিয়ে গেল আপনাকে ?"

"হ্যা—"

"আমি শুনেছিলাম কালকে, বাবুর কে এক শালা এসেছে—তাকে আপনার জায়গায় রাখবে।"

"সেকি ! এই না নিজেই উনি সব কাজ চালাবেন !"

"ইস্ ! উনি করবেন কাজ, আপনিও বিশ্বেস করেন—না বাবু —আমি নিজের কাণে সব কথা শুনেছি—"

সব বুঝিলাম। মানুষ কত ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারে !

রামলাল চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিল— "এবার কি করবেন বাবু ?"

শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম—"কি করে বলব—কে জানে ?"

রামলাল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"আপনি থাকলে বড় ভাল হত বাবু—"

সে চলিয়া গেল।

ধ্বক্-ধ্বক্-খটাস—মেসিনটা চলিতেছে।

ভাস্করের কণ্ঠস্বর বহুদিন পরে শুনিতে পাই—"এবার আমাদের পালা ভাই সব—এবার পৃথিবী হবে আমাদের। দুঃখকে ভয় পেয়ো না। আঘাতের প্রতিঘাত আছে—যারা আমাদের দুঃখ দিয়েছে, আর দেয়—দুঃখের খড়্গ এবার তাদের শোণিতে রঞ্জিত হবে। দুঃখকে ভয় পেয়ো না ভাইসব—দুঃখই ত' আমাদের অস্ত্র—"

কিন্তু তবু ভয় পাই ; চাকুরী ত' গেল, এবার কি করিব ?

রাস্তায় যখন সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসিল, তখন বাহির হইলাম—নগদ চল্লিশটি টাকা পকেটে। সারা পৃথিবীটা মুহূর্ত্তে যেন বদলাইয়া গিয়াছে। দেবী। ১০ই বৈশাখ। হায় সাহিত্যিক, কেবলমাত্র ভালবাসিলেই কি চলে ? কেবল হৃদয়টাই ত' এ পৃথিবীতে সব নয়, অর্থ, প্রতিপত্তি যতক্ষণ না থাকিবে—ততক্ষণ তুমি কে—তোমার কতটুকু মূল্য ? 'আমার মেয়ে যাতে সর্ব্বপ্রকার সুখে থাকে আমি সেই চেষ্টাই করব।'

নিজের দৃষ্টির হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করিলাম। চলিতে চলিতে সহরের গণ্ডী পার হইয়া পৌছিলাম উন্মুক্ত প্রান্তরে। দূরে বৃক্ষশ্রেণী আকাশপটে বক্র কৃষ্ণরেখা আঁকিয়াছে।

কৃষকেরা তখনও কাজ করিতেছে। অনাবৃত, কঠিন দেহ, শিরাসঙ্কুল কর্ম্মঠ হাত পা, ক্লান্ত ও শীর্ণ বলদ, লোহার লাঙ্গল আর মাটীর সহিত তাহাদের সৃষ্টির কথা।

আকাশের ম্লান আলো, দূরের কালো ছায়া আর আমার জ্বলন্ত দৃষ্টির

মধ্য হইতে যেন হঠাৎ ভাস্কর আত্মপ্রকাশ কারল। কৃষকদের মধ্যে াগয়া সে দাঁড়াইল।

কৃষকদের লাঙ্গল থামিল, বলদের গতি থামিল—তাহারা চাহিল তাহার দিকে।

ভাস্কর প্রশ্ন করিল, "ভাই সব—এ মাটী কার ?"

কৃষকেরা উত্তর দিল—"জমিদারের—"

ভাস্করের গর্জ্জনধ্বনি প্রান্তরকে কম্পিত করিল—"না—ভাইসব এ মাটী তোমাদের—যে মাটী চষে মাটী ত' তারই। কিন্তু সাবধান, একদল চোর আছে এই পৃথিবীতে—যারা তোমার জিনিষ তোমারই চোখের সামনে চুরি করবে—তাদের প্রশ্রয় দিও না। ভয় পেয়ো না—তোমাদের দিন আসছে—মনে রেখো শেষ জয় হবে আমাদের।"

সূর্য্য কি অস্ত যাইতেছে ? না, নূতন সূর্য্যের আলো কৃষকদের চোখে জ্বলিয়া উঠিতেছে। আকাশে, বাতাসে, উন্মুক্ত প্রান্তরের বিরাট বুকে ফসলের স্বপ্নের সহিত ভবিষ্যতের একটি স্বপ্ন এক হইয়া যায়। সঙ্গীত শুনিতে পাই। জমিদার আর রাজার শ্যেনদৃষ্টি ভবিষ্যতে যে ফসলের উপর থাকিবে না—সেই ফসলের গান। ভবিষ্যতে যে কৃষকেরা মাটীকে আর হারাইবে না—তাহাদের গান। সহস্র সহস্র প্রজাপতির পক্ষধ্বনি, অসংখ্য মধুপের গুঞ্জনধ্বনি, বসন্তকালীন পুষ্পের আধো আধো কণ্ঠের অস্ফুট গান—সব যেনসেই ফসলের আর মাটীর গানের সহিত মিশিয়া আছে।

তবু মনে আমার আনন্দ নাই।

একদল যাযাবর পাখী উড়িয়া চলিয়াছে। উঠিলাম।

উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিকটা ঘুরিয়া গঙ্গাতীরে যাই। একটা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সময় কাটাই। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। দূরে দিকচক্রবালে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—কিন্তু তার

রেশ তখনও বর্ত্তমান। ওপারের গাছপালাগুলি নিবিড়কৃষ্ণ মসিরেখার মত স্থির, নিষ্কম্প। প্রকাণ্ড বড় চড়াটার ধারে কয়েকটি মহাজনী নৌকা নোঙ্গর ফেলিয়াছে, উনান প্রস্তুত করিয়া কয়েকজন মাঝি রাঁধিতেও বসিয়াছে। উপরের আকাশ আসন্ন রাত্রির প্রতীক্ষায় নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস। কাণ পাতিয়া গঙ্গার কলধ্বনি শুনি।

ক্রমে অন্ধকার যখন গাঢ় হইতে চলিল—তখন উঠিলাম। হঠাৎ যোগেশদার কথা মনে পড়িল।

যোগেশদার বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম।

যোগেশদা একগাল হাসি হাসিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন—"আয় আয় ভাই—তোর কথাই ভাবছিলাম—

বসিয়া হাসিয়া বলিলাম, "যোগেশদা, এখানকার পাট ত' উঠল—"

"কেন রে?"

"চাকরীটা আজ গেল।"

"সে কি! কেন?"

"কেন জানি না—বোধ হয় নরেনবাবু নিজের শালাকে আমার জায়গায় রাখবেন—"

যোগেশদা সান্ত্বনা দিলেন, "দুঃখু করিসনা, আর একটা জুটে যাবে।"

অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম—আমার অদৃষ্টটা দেখছেন ত'—কোন কিছুই হয় না—যাও বা হয় সব ভেস্তে যায়—"

যোগেশদা আমাব কথার উত্তর না দিয়া ডাকিলেন—"রামু—দুকাপ চা আর কিছু খাবার নিয়ে আয় ত—"

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোর জ্ঞান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী তবুও তোকে একটা কথা বলি—বিশ্বাসে সবকিছুই হয়।

জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হোস না—অখণ্ড বিশ্বাসে এগিয়ে যা। আমি বলছি তোকে, ঈশ্বর যদি থাকেন তবে নিরাশ হবি না।"

মাথা নাড়িলাম—"ঈশ্বরে আজকাল বিশ্বাস হয় না।"

যোগেশদা মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন—"আছে—সব কিছুরই সময় আছে —পরে বুঝবি।"

চা আসিল। নিঃশব্দে পান করি, কিন্তু সব বিস্বাদ লাগে।

যোগেশদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"মন খারাপ করিস্ না রে, চেষ্টা করব আমি, যাতে শিগ্‌গীর একটা কিছু জুটে যায়। কাল বিকেলে একবার আসিস্—দু'একজনেব সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাব।"

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম, খাইবার স্পৃহা ছিল না।

কিন্তু খানিকপরে গৌরীদেব চাকব আসিয়া হাজির হইল, হাতে গৌরীর চিঠি।

আবার বাহিব হইলাম।

দেখি দ্বাবপার্শ্বে গৌরী দাড়াইয়া আছে।

আমায় দেখিয়া তাহাব দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

হাসিয়া বলিলাম—"আজকে খাবার ইচ্ছে নাই ভাই।"

নিঃশব্দে আমার দিকে খানিকক্ষণ কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিল—"ইচ্ছে নেই—সেটা না আসলে বুঝব কি করে বল দেখি। তোমার জন্যে বসে বসে ঝিমোচ্ছি খালি—অথচ তোমার একটুও হুশ নেই!"

বলিলাম—"রাগ করো না গৌরী—"

সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"রাগ করবই ত. নিশ্চয় করব, একশ'বার করব—নাও, এবার চল দেখি—"

"খাব না আমি—"

"খেতেই হবে তোমাকে—আমায় এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য তোমায় প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে— চল।"

তাহার দিকে চাহিলাম, বুঝিলাম কথা চলিবে না।

নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিয়া খাবার ঘরে গেলাম।

গৌরীর মা বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এই যে এসেছ বাবা—আজ এত দেরী করলে যে; আমরা ভেবে মরছি। গৌরী ত খাবেই না, এই এতক্ষণ বসে থাকবার পর বল্লাম যে একবার রামুকে পাঠিয়ে দেখ। নাও—এবার বোস তোমরা দু'জনে।"

খাইতে বসিলাম। মাসীমার দিকে তাকাই, গৌরীর দিকে তাকাই। মায়ের কথা মনে পড়ে। চোখে জল আসে।

আমার শুষ্কমুখ দেখিয়া মাসীমা প্রশ্ন করিলেন—"আজ অমন মনমরা ভাব কেন বাবা, কি হয়েছে?"

একটু ভাবিয়া বলিলাম—"চাকরীটা আজ গেল মাসীমা—"

গৌরী চমকিয়া আমার দিকে চাহিল।

মাসীমা একটু চুপ করিলেন, কি যেন ভাবিলেন, পরে বলিলেন—গেছে, গেছে—খেয়ে নাও—আর একটা হবেই—মানুষ কি বসে থাকে নাকি।"

মাসীমা ভারী অদ্ভুত মেয়ে—তাঁহার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের দৃঢ়তা আছে যা পুরুষদের মধ্যেও দেখা যায় না।

খাওয়া শেষ হইলে গৌরী পান সাজিয়া আনিল।

দরজার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সে ডাকিল—"মেজদা—"

থামিলাম।

"কিছু মনে করো না—তোমার একথা ত' আমি জানতাম না—"

"কেন—মনে কি করব?—"

"তোমায় রেগে কত কি বল্লাম—"

বিস্ময়ের সুরে বলিলাম—"কি আবার বল্লে, না, তুমি একটি আস্ত পাগ্‌লী—"

সে হাসিল না—যে হাসি তাহার মুখে সর্ব্বসময়ে সূর্য্যের আলোর মত ঝক্‌ঝক্‌ করে—সে হাসি যেন কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ সে অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিল, দুইহাতে আমার একটি হাত টানিয়া লইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মত ভাঙ্গা গলায় বলিল—"দুঃখ করো না মেজদা—চাকরী গেছে ত' কি, আবার হবে—"

হাসিয়া রসিকতা করিবার চেষ্টায় বলিলাম—"নিশ্চয়ই হবে, তাছাড়া আমার ভাবনা কি, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা আমার বোন। হ্যাঁ ভাই, ভবিষ্যতে যখন বিলেৎফেরতের গিন্নী হবে—তখন আমায় দু'এক হাজার টাকা দিতে পারবে না ?—দিও ভাই, এই পৃথিবীতে অনেক কিছু দেখবার আছে—কিছু দেখে নিতাম—"

হঠাৎ থামিয়া গেলাম। গৌরী আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখটা ফিরাইয়া কান্না চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।"

রাস্তায় পা দিলাম। ঈশ্বর আছেন কি না তা ত' জানি না—তাই ঊর্দ্ধের শান্ত সমাহিত আকাশ, ধীর বাতাস আর অদৃশ্য সমস্ত শক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—গৌরীর জীবন যেন সুন্দর হয়, সার্থক হয়।

পশ্চিমের আর উত্তর দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া লিখিতে বসিলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, বাড়ীটা আরও। কিন্তু এই নিস্তব্ধতার মধ্যেও শুনি কাহারা যেন চলাফেরা করিতেছে। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকি—ক্রমে ধীরে ধীরে সেই সব অশরীরীরা দেহলাভ করে, বাহিরের পৃথিবীটা অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই দীর্ঘ একমাসে ভাস্কর কি করিল ?

তাহাকে খুঁজি।

নগরের আবর্জ্জনাময় প্রান্তদেশে যত সব কালো কালো মানুষদের বস্তীতে তাহাকে খুঁজি। দূরে একটা নর্দ্দমার ধারে কয়েকটা মরা ইঁদুর লইয়া কয়েকটা শীর্ণকায় কুকুর কাড়াকাড়ি করিতেছে, অবর্ণনীয় কৌতূহল ভরে কয়েকটা দশ বার বৎসরের নগ্ন বালক-বালিকা তাহাদের সেই ভোজ দেখিতেছে।

ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলির একপাশে একটি তালপাতার ছাউনিতে ঢাকা বড় ঘরে—দিশি মদের ভাঁড় সম্মুখে রাখিয়া জন কুড়ি লোক বসিয়া নেশা জমাইতেছে। ঘাম আর ময়লায় তাহাদের দেহ ক্লেদাক্ত হইয়া চক্ চক্ করিতেছে।

হঠাৎ এককোণ হইতে ঢোলকটা টানিয়া লইয়া ছোট্টু বলিল—"একটা লাচ্ গানা হোক্ এবার, কি বল ভাইসব ?

জড়িতকণ্ঠে সকলে প্রত্যুত্তর দিল—"হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই—"

ছোট্টু তাহার পার্শ্বস্থিত একটি অসম্বৃতবাসা যুবতীর দেহে খোঁচা মারিয়া বলিল—"ওরে মাগী—এই সুরতিয়া—উঠ্—"

সুরতিয়া জড়িতস্বরে তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, "অরে থাম্ শালা—"

ছোট্টু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আবার ধাক্কা দিল—"আরে উঠ্‌বি কিনা ?"

সুরতিয়া উঠিল।

"লে—একটা লাচ্ গানা কর দেখি—"

ঢোলকে ছোট্টু কয়েকটা চাপড় মারিল।

কুকুরগুলি পরম আনন্দে পচা ইঁদুরগুলি চর্ব্বণ করিতেছে। বাতাসে তাহাদের নশ্বর দেহের গন্ধ।

ঢোলকের শব্দে বালক-বালিকারা আসিয়া ভাটিখানার সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

সুরতিয়া সাড়ীর প্রান্তদেশ কোমরে জড়াইয়া লইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল, নাচিতে আরম্ভ করিল। মাথা নাড়িয়া দুই ঘোলাটে চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া ছোট্টু ঢোলক বাজায়।

"কালো ছোড়ার কোমর ধরে
নাচে মাতাল ছুড়ী রে—
নাচে মাতাল ছুড়ী—"

হো—হো—হো। মাতালেরা সায় দেয় আর হাসে। সুরতিয়া নাচিতে থাকে। তাহার গুরু নিতম্ব দোলে, হাতগুলি কখনও শ্লথভাবে, কখনও বিসর্পিল ভঙ্গিতে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হয়, পরিপুষ্ট কালোদেহের উপর একটি মদির তরঙ্গের বারংবার উঠানামা দেখা যায়। তাহার চোখ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠে, ভ্রূ উদ্ধোৎক্ষিপ্ত হয়, মাথার রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত হইয়া পিছনে সহস্র কালনাগিণীর মত কাঁপিতে থাকে। বাতাসেতে তবু পচা ইঁদুরের দেহ গন্ধ আর নদ্দমার বাষ্প। ভাস্কর কই? হো—হো—হো। মদের নেশায় চুর হইয়া একটি যুবতী হঠাৎ দুনিয়াটাকে রঙীন দেখে, একটি কালো যুবকের কোমর জড়াইয়া সে নাচে আর গাহে আর বলে—কত টাকা দিবি আমায়, যদি যাই তোর ঘরে? হো—হো—হো—আকাশটা পরিষ্কার—ঝক্‌ঝকে—যেন মধ্যাহ্নের মরুভূমি, বাতাসেতে মাতালদের পুত্রকন্যা ও কুকুর শুয়ারের বিষ্ঠার গন্ধ, দেহেতে ঘাম আর নর্দ্দমার মাটি, বুকে দিশি মদের তীব্র জ্বালা, তবু তারা মানুষ। হো—হো—হো—তাহারা মানুষ—তবু তাহাদের কেহ ছোয় না—তাহারা পতিত। তাতে ভয় কি, কাজ কর আর ফুর্ত্তি কর—অদৃষ্টকে কে খণ্ডাইবে, বল ভাই

অদৃষ্টকে কে জয় করিবে ? হো—হো—হো—ছোট্ট মৃগীরোগীর মত মাথা নাড়িয়া ঢোলক চাপড়ায়, মাতালেরা নেশায় মুদ্রিত চক্ষু জোর করিয়া খুলিয়া রাখিয়া রক্তের সঙ্গীত শোনে আর সুরতিয়া নাচে। তাহার গতি এখন দ্রুত—কালো দেহে সাদা ঘাম চক্‌চক্ করে, পীনোন্নত দক্ষিণ স্তনটা সাড়ীর অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া মাতালদের নেশার মূলে কুঠারাঘাত করে আর আদিম অরণ্যের অন্ধকার ঘনায় রক্তের মধ্যে। হো—হো—হো। সুরতিয়ার দ্রুত পদক্ষেপে, আর ছোট্টুর ঢোলকের শব্দে ঘরের মাটি কাঁপে, আর কাঁপে মাতালের বুক। কালো যুবতী যুবকটিকে বলে—ফুর্ত্তি করি, ওরে ছোড়া ফুর্ত্তি কর্! জানি, আমরা মানুষ হয়েও মানুষ না—জন্ম মৃত্যুতেই কেবল আমরা আর সকলের সমান। তবে কি নিয়ে বাঁচবি রে ছোড়া, কি নিয়ে বাঁচবি, খা—কাজ কর আর ফুর্ত্তি কর্—দেখ্ কি সদা আমার দেহে জীবনের চরম আস্বাদ পাবি এর স্তরে স্তরে—আয় তোর চোখে নেশার আগুন নিয়ে—হো—হো—হো—

"হো—ও—ও"—হঠাৎ শোনা যায় একশ' মানুষের কণ্ঠস্বর—

"হো—ও—ও—ভাই সব"—একশজন কালো লোক মাতালদের ডাকে।

কালো মেঘের আড়াল হইতে যেমন বিদ্যুৎ বাহির হইয়া আসে, তেমনিভাবে একশ'জন কালো লোকের ভিতর হইতে ভাস্কর বাহির হইয়া আসিল।

"ভাই সব—এই নাচ গানের চেয়ে বড় কাজ তোমাদের এবার কর্ত্তে হবে—"

নাচ বন্ধ হইল, বন্ধ হইল ছোট্টুর ঢোলক আর কুড়িজন মাতালেরা ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আমাদের সঙ্গে চল"—একশ জন লোকের আহ্বান ধ্বনিত হইল।

সকলে গিয়া দাঁড়াইল উন্মুক্ত জায়গায়। ধূলির উপর ধূলিমলিন দেহে বসিয়া সকলে চাহিল ভাস্করের মুখের দিকে।

ভাস্কর বলিল—"তোমরা মানুষ হয়েও অমানুষের মত এতদিন কাটিয়েছ বলে চিরকাল কি তেমনি কাটাতে চাও—বল—তাই কি চাও?"

মাতালদের নেশা ভাঙ্গিয়াছে—একশ জন লোকের সহিত গলা মিলাইয়া তাহারা বলিল—"না"—

ভাস্কর বলিল "তোমরা আর সকলের মতই মানুষ—তবু কেন এ দুঃখ? কেন সইবে তোমরা এই অপমান? তোমাদের কেউ ছোঁয় না তোমাদের সকলে দূরে সরিয়ে রাখে, যত দুর্গন্ধ আর নোংরা জিনিষের ভার তোমাদের উপর—বল—তোমরা কি জানোয়ার?"

দূরস্থিত বজ্রের হুঙ্কারের মত সকলে অবরুদ্ধ গর্জ্জন করিয়া বলিল—"আমরা মানুষ"—

আকাশে একটি শঙ্খচিল উড়িয়া নীচের পৃথিবীকে দেখে।

"তবে মানুষের কাজ এবার তোমাদেরই কর্ত্তে হবে। আর বাজে কাজে সময় নষ্ট নয়, দিন আসছে ভাই সব, এ পৃথিবীর চেহারা বদলাবার ভার এবার তোমাদের উপর।"

ধূলির বুকে স্পন্দন জাগে। নর্দ্দমার কাদা আর বাঁশের অন্তরালে বন্দী আত্মার শিহরণ। সূর্য্য পশ্চিম দিকে।

"হাজার হাজার বছর ধরে একদল মানুষ আর একদলকে রেখেছে পায়ের তলায়, কিন্তু চিরদিনই তা থাক্‌বে না—কারণ চিরদিন কোন কিছুই থাকে না। তোমাদের জীবনও সত্য—তোমাদের জীবনকেও সুন্দর কর্ত্তে হবে।"

"আমাদের জীবনও সত্য—হ্যাঁ—আমাদের জীবনকে সুন্দর কর্ত্তে হবে।"

"যে বাধা দেবে—তাকে নিশ্চিহ্ন করবে, এতে পাপ হবে না। যাতে পাপ নেই তাতে ভয় কি? ভাই সব—এ পৃথিবী তোমাদের সকলের—তোমরা সকলে সমান।"

সম্মিলিত সঙ্গীতের শত শতাধিক উত্তেজিত কণ্ঠ গর্জিয়া বলিল, "এ পৃথিবী আমাদের—আমরা সবাই সমান—"

"আর এ ময়লার আবরণে নয়, আর এ মদ আর বিস্মৃতি নয়, তৈরী হও—তোমাদের দিন আস্‌ছে—"

"আর বিস্মৃতি নয়, হ্যাঁ—আমাদের দিন আসছে—"

"ডাক যেদিন আসবে—সেদিন সবাই একসঙ্গে চলবে, পৃথিবীর যত অসুন্দর জিনিষ, মানুষের যত অবমাননাকারী, সাম্যের শত্রু—সকলকে চূর্ণ করবে—পৃথিবীর শেষ বিপ্লব তোমরা করবে।"

"পৃথিবীর শেষ বিপ্লব আমরা কর্ব্ব—ভাই সব এবার ডাক আসবে—"

"আর সেই ধ্বংসলীলার মাঝে সুন্দর মানুষের পৃথিবী গড়ে তুলে—তোমরা গাইবে—মানুষের জয়—মানুষের চেয়ে কেউ বড় নয়—"

"মানুষের জয়—হ্যাঁ——মানুষের চেয়ে বড় কেউ নয়"—শতাধিক কালো লোকের কণ্ঠে শতাধিক কোকিলের মিষ্টতা। বাতাস সেই ধ্বনিতে তন্দ্রামগ্ন হয়। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু তবু এই শতাধিক লোকের চোখে অন্ধকার নামিবে না, কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে পৃথিবীর ভার এবার তাহাদের উপর।

ক্রমে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। লোকেরা যে যার বাড়ী ফিরিল। ভাস্করও চলিল।

তাহার কাঁধে হাত রাখিলাম।

সে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিল, বলিল, "নমস্কার—কেমন আছেন?"

বলিলাম,—"এই মুহূর্ত্তে—তোমার সঙ্গে ভাল আছি।"

সে আবার মৃদু হাসিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

বলিলাম, "অনেকদিন তোমার দেখা পাইনি—কতদূর কি করলে ভাস্কর ?"

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"অনেকদূর এগিয়েছি—আমাদের দিন আস্‌ছে।"

"সেদিন কি করবে ?"

"সব ভাঙ্‌ব—"

"তারপর ?"

"সে কথা এখনও ভাবি নি, ভাবার দরকার নেই, এখন ভাঙ্গার কথাটাই বড়। ভাঙ্গন যখন শেষ হবে, তখন তৈরী করার কথা ভাবব।"

তাহার ধীরকণ্ঠে অনাগত মহাবিপ্লবের ধ্বংসের বজ্রধ্বনি একবার শুনিতে পাইলাম। পুলকে, ভয়ে, আশায়—আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ভাস্কর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে ঘনশ্যাম ও আরও দুইজন লোক বসিয়া আছে। একজনের বয়স বছর পয়ত্রিশ আর একজনের গোটা ষাট। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের লোকটি খুব মোটা, কালো। মাথার কয়েকটি চুলে পাক ধরিয়াছে, পোষাক পরিচ্ছদে বড় বাবুয়ানা।

ঘনশ্যাম ভাস্করকে দেখিয়াই বলিল, "এসো বাবা—এস—"

ভাস্কর বসিল।

ঘনশ্যাম বিশেষভাবে সজ্জিত লোকটির দিকে দেখাইয়া বলিল—"বুঝলে বাবা ভাস্কর—হেঁ হেঁ—এর নাম শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য—আর ইনি এর কাকা—শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য। এঁদের সহরে কাঠের দোকান আছে—হেঁ হেঁ—এরা বহ্নিকে দেখতে এসেছেন—"

ভাস্কর বলিল—"বেশ ত—তা দেখুন না—"

ঘনশ্যাম হঠাৎ উঠিল, শোন বাবা, একটা দরকারী কথা আছে—"

দরজার সন্নিকটে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সে বলিল, "কিন্তু এদিকে বড় মুস্কিল হয়ে গেছে বাবা, মানে হেঁ হেঁ—বহ্নি কিছুতেই সাজবে না—আর বাইরে আসবে না—"

"কেন ?" ভাস্কর কৌতুক বোধ করিল।

"কেন সেই জানে, যে রকম গোঁয়ার মেয়ে—বেশী কথা বলতে ভয় লাগে—অথচ এদিকে ঘণ্টা দুয়েক হতে চলল—"

"অতএব ?—"

"—তাইত ভাবছি—আচ্ছা বাবা, তুমি একবার বলে দেখ না—"

"আমি ! আমার কথা শুনবে কেন ?"

"একবার বলেই দেখ না—তোমায় ও ভক্তি করে।"

"বটে ! তবে একবার ভক্তকে পরীক্ষা করতেই হবে—"

"যাও বাবা—এমন পাত্তর হাতছাড়া হয়ে গেলে বড় মুস্কিল হবে বাবা—গরীবের ভাগ্যে এমন ধনী পাত্তর সহজে জোটে না—খালি ওর চেহারার কথা শুনেই এসেছে—হেঁ হেঁ—"

"আচ্ছা—আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন।"

বহ্নি বিছানার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছিল, তাহার মা দরজার পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়াছিল !

"বহ্নি"—ভাস্কর ডাকিল।

"কি ?"

"কেন বাবাকে আর ভদ্রলোকদের কষ্ট দিচ্ছ ?"

বহ্নি মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ ধপ করিয়া বইটা বন্ধ করিয়া বিছানার একপার্শ্বে ফেলিয়া দিল।

বহ্নির মা বলিল, "সত্যি বল দেখি বাবা, এ কি রকম ভদ্রতা! তোর বয়েস হচ্ছে—বাপের মুখ নীচু করা কি তোর উচিত?"

বহ্নি সে কথায় কোনও দৃকপাত না করিয়া ভাস্করের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, "আপনিও কি ওদের দলে নাকি?"

ভাস্কর চোখ বড় বড় করিল, "আমি কোন দলেই নেই, আমি শুধু নিরপেক্ষ দর্শক—তবুও একটা কথা এই যে তুমি কেন ওদের সামনে যাবে না?"

"আমার পছন্দ হয় না—এ সব পুরানো কালের প্রথা—"

"কিন্তু একদিন ত' তোমাকে এই গতানুগতিক প্রথা মানতেই হবে—আমাদের দেশের নারীধর্ম্মের চরম সার্থকতার এ ছাড়া আর ত' কোনও উপায় নেই—"

বহ্নির চোখে আগুন জ্বলিল—"আমি গতানুগতিককে ভাঙ্গব। মানুষের মন বলে একটি পদার্থ আছে—তাকে অগ্রাহ্য করায় কোনও গৌরব নেই। বিবাহের চেয়ে বড় জিনিষ দুটো মনের মিল। বিবাহ ত' তাকে স্বীকার করার প্রথা হওয়া উচিত।"

বহ্নির মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিল, "কি যে বলিস বহ্নি—কিচ্ছু বুঝি না—ছোটমুখে যত সব বড় বড় কথা—"

ভাস্কর বলিল—"তোমার কথাগুলো ভাল লাগছে—কিন্তু—এখন একবার তোমার যাওয়া উচিত, এতে তোমার মহৎ উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না—"

"আপনি যেতে বলছেন?"

"আমার কথার কি কোনও মূল্য আছে—আমি—"

"বাজে কথা নয়—চলুন তবে—"

বহ্নির মা'র কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল, "আয় সাজিয়ে দি—"

"তাহলে মোটেই যাব না মা, আমি বেশ্যা নই—"

"যা ইচ্ছে করগে তবে"—বহ্নির মা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

"চলুন"—বহ্নি বলিল।

"চল—"

বাহিরের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বহ্নি হাত তুলিয়া বলিল—"নমস্কার—"

ভদ্রলোক দুইটি হঠাৎ পিছন ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে চোখ ললাটে তুলিল—ঘনশ্যামের চক্ষু ক্রোধে আর লজ্জায় জ্বলিতে লাগিল।

"আপনারা আমায় দেখতে এসেছেন শুনলাম—তা দেখুন—"

গণেশের চক্ষু দুইটি বিমুগ্ধ প্রশংসায় জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল—সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"বসুন"

নিতাই ভট্টাচার্য্য ভাবিতে লাগিল যে ইহা যথার্থই স্বপ্ন কি না।

বহ্নি মাথা নাড়িল,—মাফ করবেন, আমি বসব না। আপনারা আমায় প্রাণ ভরে দেখে নিন কিন্তু আসল কথাটা শুনে রাখুন, আমি বিয়ে করব না।"

গণেশ শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "একেবারেই বিয়ে করবেন না?"

"করলেও আপনাকে ত' না—এটা নিশ্চয়—আচ্ছা এবার আসি—নমস্কার—"

বহ্নি চলিয়া গেল।

গণেশের চোখ ছলছল করিতে লাগিল—সে বহ্নিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

নিতাই ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে চুপ করিয়াছিল,

বহ্নি চলিয়া যাইতেই তাহার মোহ ভঙ্গ হইল, সে এইবার ফাটিয়া পড়িল, "আচ্ছা ঘনশ্যাম বাবু—ডেকে এনে অপমান করার কি দরকার ছিল বলুন ত ?—"

ঘনশ্যাম হাত জোড় করিয়া লজ্জিতকণ্ঠে বলিল—"হাজার বার মাফ চাইছি—কিছু মনে করবেন না—মানে হেঁ হেঁ—ওর মাথার একটু দোষ আছে—"

"সেটা আগে বললেই পারতেন মশাই—কষ্ট হত না—দুনিয়ায় মেয়ের অভাব নেই তা জানেন—"

ঘনশ্যাম কথা খুঁজিয়া পায় না, কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল, "মাফ করবেন —বুঝতেই ত পারছেন নিতাইবাবু আমার দোষ নেই—নইলে আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার সৌভাগ্য—"

"থাক হয়েছে—চল্‌রে গণ্‌শা—"

গণেশ মিহিস্বরে বলিল—"চলুন"—যাইতে যাইতে হঠাৎ সে ফিরিয়া আসিল—ভাস্করকে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"দেখুন স্যর, কাকার কথায় কিছু মনে করবেন না—আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। চেষ্টা করে দেখবেন স্যর, যদি আমায় পছন্দ হয়, রাণীর হালে রাখব—মাইবি বলছি —"

"গণ্‌শা"—নিতাই ভট্টাচার্য্যের ক্রুদ্ধ আহ্বান ধ্বনিত হইল।

"যাচ্ছি—"

ভাস্কর হাসিল।

নিতাই ভট্টাচার্য্য ও গণেশের পদক্ষেপ দূরে মিলাইয়া গেল।

ঘনশ্যাম পাথরের মত দ্বারপার্শ্বে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বহ্নির মা প্রবেশ করিল।

ঘনশ্যাম তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "শুনলে ত'— তোমার মেয়ে কি কাণ্ড করলে—"

"শুনলাম—হতভাগীর কপালে অনেক দুঃখু আছে"

"আর আমায় হেঁ হেঁ—কি অপমানটাই না করে গেল !"

"যাক্‌গে—যা হবার হয়েছে—এখন খেতে চল।"

"না—আমি খাব না—"

বহ্নি হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল।

"দোহাই বাবা—আমার ওপর রাগ করে নিজে কষ্ট পেয়ো না—কোত্থেকে একটা বনমানুষ ধরে নিয়ে এসেছিলে বলেই তাড়িয়ে দিলাম। আমার জন্য তুমি ভেবো না বাবা—বিয়ে না করেও জীবন ভালভাবে কাটান যায়—"

"থাম্ বাপ্—তোর কোন কথা শুন্‌তে চাই না।"

"রাগ করো না বাবা—যাও এবার খেতে যাও—"

"না—আমি যাব না—"

"ফের কিন্তু একটা কিছু করে বসব—শিগ্‌গীর যাও—"

"যাচ্ছি বাপু—যাচ্ছি—বাপ্ রে বাপ্—মেয়ে ত নয়, হেঁ হেঁ—যেন বাঘিনী—"

"সত্যিই তাই—যাও—নইলে কামড়াব কিন্তু—"

ঘনশ্যাম ও বহ্নির মা গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল

ঘরেতে এবার ভাস্কর আর বহ্নি।

ভাস্কর বলিল—"চমৎকার !"

বহ্নি বিদ্যুৎভরা কটাক্ষ হানিয়া বলিল—"কি চমৎকার ?"

"তুমি—"

"বটে ? কেন ?"

"তা জানি না। আচ্ছা বহ্নি তুমি বিয়ে করবে না কেন?"

"বিয়ে করব না—তা ত' বলিনি। আমার এসব পুরানো অসভ্য প্রথা ভাল লাগে না। যাকে তাকে বিয়ে করা যায় না।"

"কাকে বিয়ে করা যায়?"

"যাকে ভালবাসি—"

"ভালবাসা! সেটা কি বহ্নি?" কৌতূহলী শিশুর মত স্বচ্ছন্দে, অকপটে ভাস্কর প্রশ্ন করিল।

বহ্নি তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিল, পরে একটু হাসিয়া বলিল, "ওটা বোঝান যায় না—নিজে বুঝতে হয়।"

"ওঃ—আচ্ছা—তুমি বিয়ে করে কি কর্ত্তে চাও? আর সকলের মত মা হবে, রান্না করবে, বুড়ী হবে, পান চিবিয়ে পরনিন্দা করবে—এই ত?"

"ছিঃ"—বহ্নি বলিল।

"কেন?"

"আমায় কি আর সকলের মত মনে হয়?"

"না—"

"তবে শুনুন—আমি নারীত্বের নূতন আদর্শ চাই—আমাদের জীবনটা যেন যন্ত্র হয়ে গেছে—আমি তা ভাঙ্গ্ব। আজ থেকে আমি তা সুরু করলাম। আমরা যেমন সুন্দর তেমনি ভয়ঙ্করও হতে পারি—এটা এবার আপনারা বুঝবেন। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য নেই—পৃথিবীতে জমেছে অনেক পাপ—আমরা তা দূর কর্ত্তে আপনাদের সাহায্য করব—"

"কিন্তু তোমরা ত' এখনও বদ্‌লাওনি?"

"এবার থেকে সুরু হবে তা, পাউডার, স্নো আর আল্‌তা যাবে দূরে, বহু বন্ধনের শিকল এবার ভাঙ্গ্‌বে—"

"তারপর?"

"তারপর ভাঙ্গন যখন শেষ হবে তখন আমরা সৃষ্টি করব চিরস্থায়ী সুন্দর পৃথিবী ও সমাজ, কারণ আমাদের চেয়ে বড় স্রষ্টাকে—আমরা পুরুষদেরও জন্ম দিই—"

ভাস্কর মুগ্ধনেত্রে নিষ্পলকভাবে বহ্নির দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিল, কি যেন কাণ পাতিয়া শুনিল—তারপরে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল—"তাই হোক্—আজ থেকে তোমার এই ব্রত তুমি পালন কর বহ্নি। সমস্ত মেয়েদের ভার নাও তুমি—অবরোধের অন্ধকারকে দূর করে যে সূর্য্যালোককে তোমরা এতদিন অপমান করেছ তার দীপ্তিতে ভাস্বর হও—তনুমনের কোমলতাকে ঢাক লোহার কাঠিন্যে। বহু বিপ্লব হয়েছে—সামাজিক, রাষ্ট্রীয়—কিন্তু যে মহা বিপ্লব এবার হবে তা মানুষের সাম্যের জন্য—সেই মহাবিপ্লবকে তোমাদের সাহায্য ছাড়া ত' সফল করা যাবে না। তাই ভাল বহ্নি—ভাঙ্গ সব—যত সব পুরাতন পচা, জীর্ণ প্রাসাদ, ভাঙ্গ সব ব্যভিচার আর অবিচারের স্তম্ভ—ফুৎকারে উড়াও সব ধর্ম্ম আর সংস্কারের পতাকা—"

"তুমি কি ধর্ম্ম মান না?"

"না—ধর্ম্ম ত' মানুষের অধর্ম্মের বর্ম্ম, ধর্ম্ম একটা নেশা যার ঘোরে মানুষ অপরকে আর নিজেকে ফাঁকি দেয়—ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছিল বর্ব্বর যুগে—যার সাহায্যে দশটা লোক হাজারটা লোককে নিষ্পেষিত করে—সে বর্ব্বর যুগ এখনও কাটে নি। ধর্ম্ম মানুষের দাসমনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে—এক মানুষকে আর এক মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়—ধ্বংস কর সকল ধর্ম্ম—যা মানুষকে অন্ধ করে তোলে। শোন বহ্নি, মানুষের মানবতা ছাড়া অন্য ধর্ম্ম নেই—"

"তুমি কি ভগবান মান না?"

"না—কারণ ভগবান মৃত, কারণ মানুষই ভগবান। কতকগুলি বস্তুর

সংযোগে উৎপন্ন একটা শক্তি আছে—তাকে তুমি ভগবান বলতে পার, আমিও বলি—কিন্তু হাত পা, নাক, চোখ, মুখ—অবিকল আমাদের মত কোনও ভগবান নেই। যদি থাকে তবে সে শক্তিমান আসুন না সাম্‌নে —ডাক না তাকে ?"

বহ্নি উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়িল, "ডাকার দরকার নেই—আমিও মানি না এই রূপকথার ভগবানকে। তবে আমি মানি সেই সব মানুষ ভগবানকে—যারা পৃথিবীকে ভালরূপে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিল। যে ভাঙ্গতে পারে আর সৃষ্টি কর্ত্তে পারে সেই ভগবান—যার কর্ম্মে সমস্ত মানুষ উপকৃত হয় সেই ভগবান--"

হ্যাঁ—ঠিক বলেছ—ভগবান নেই—ভগবান মৃত—আমরা এবার তার প্রেতকৃত্য সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান করব। প্রত্যেক প্রাণী—প্রত্যেক শক্তিই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়--যদি ভগবান বলে একটি বিশিষ্ট প্রাণী থাক্‌ত তবে সে নিশ্চয়ই নিজেকে প্রকাশ করত—সহস্র সহস্র বৎসরের কোটী কোটী হতভাগ্যদের আর্ত্তনাদের নিশ্চয়ই প্রতিকার করত—"

বহ্নি উজ্জ্বল চোখে ভাস্করের প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শোনে, তাঁহার বুকের কোণে কিসের যেন একটা ঝড়।

সে হঠাৎ অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিল, কণ্ঠে তাহার আবেশ—"তুমি কে ?"

ভাস্কর হাসিল—সে হাসিতে সারা কক্ষ কাঁপিয়া উঠে—"আমি অতিমানব—যুগ যুগান্তের দরিদ্র, হতভাগ্য নির্য্যাতিত মানুষদের কল্পনা থেকে তিল তিল করে আমার উদ্ভব—সহস্র সহস্র বিদ্রোহী শিল্পীর তুলিকায় আমার দেহ, বর্ণ, শক্তি ও শ্রীলাভ হয়েছে—এবার আমার বাস্তবে যাওয়ার পালা। যেদিন বিপ্লব সুরু হবে—সে দিন আমার আবির্ভাব হবে, কিন্তু তুমি কে ?"

বহ্নি স্থির নেত্রে ভাস্করের দিকে চাহিল, দুই চক্ষুর বহ্নি দিয়া তাহাকে

ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—"আমি অতিমানবের প্রেয়সী অতি মানবী, অতি মানবের সমস্ত শক্তি গচ্ছিত আছে আমার কাছে—"

ভাস্কর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল—কি বল্লে?" ছুটিয়া আসিয়া সে বহ্নির হাত ধরিল, "ওকথার মানে?" বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠাধর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, চক্ষুতারকা স্তিমিত হইয়া উঠিল, সমস্ত রক্তস্রোতে, শিরা উপশিরায়, হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে সে শুনিতে পাইল এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত।

"কি বল্লে বহ্নি—কি বল্লে?"

বহ্নিরও হাত কাঁপে, ভাস্করের লৌহকঠিন হস্তের স্পর্শে যেন সহস্র পুষ্পের কোমলতা, তাহার সারা দেহে অসহ্য পুলকের রোমাঞ্চ। মাথা নাড়িয়া, পূর্ব্বের মতই রহস্যময় হাসি হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে তিরস্কারের সুরে বলিল, "বল্লাম যে তুমি অন্ধ—তাই অন্ধ দেবতা তোমায় বোঝাননি ভলবাসা কি—"

ভাস্করের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বহ্নি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

ভাস্কর মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে কি যেন ঘটিয়া গেল। অদৃশ্য কোন এক মায়াবী তাহার কাণে কা:. কোন এক গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল।

"বহ্নি শোন—"

"না"—সহাস্য উত্তর শোনা গেল।

বহ্নি চলিয়া যাইতেছে।

ছুটিয়া গিয়া ভাস্কর তাহাকে ধরিল, সমস্ত রহস্যের শেষ হইয়াছে। দুই কঠিন হস্তে সে বহ্নিকে বক্ষে টানিয়া লইয়া এক প্রগাঢ় ও উষ্ণ চুম্বনে বহ্নির হৃদয় দুর্গকে ধূলিসাৎ করিল।

চমকিয়া উঠিলাম—এ কি হইতেছে!

ডাকিলাম—"ভাস্কর—সাবধান—"

কিন্তু ভাস্কব আমাব কথা শুনিতে পাইল না। হায় অন্ধ—এ কি করিলে?

বহ্নি তিরস্কাব কবিল—"আঃ—আস্তে—"

"চুপ্ রাক্ষসী—"

"বাবা মা দেখবেন—"

"দেখলে তাঁবা ধন্য হবেন—"

"শোন—"

"কি?—"

"এবাব বলত, ভালবাসা কি—"

ভাস্কর থামিল, বহ্নির দুই চোখেব উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া বলিল—"ভালবাসা! মানুষেব সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম, মানব জন্মেব সবচেয়ে বড় সার্থকতা।"

ক্ষিপ্তকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলাম—"একি কবলে ভাস্কর?"

সে আমার কথা এবারও শুনিল না।

ভাস্কর আর বহ্নিকে আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলাম।

ভাস্কর আমার দিকে চাহিল—"ওঃ—আপনি কিন্তু ভারী বেরসিক ত' মশাই—"

বহ্নি মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

কাতরকণ্ঠে বলিল—আমার নিষেধ শুন্‌লে না ভাস্কর—শেষে তুমিও ব্যাধিগ্রস্ত হলে?"

ভাস্কর উত্তেজিত কণ্ঠে আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"লেখক—তুমি আমায় গোপন করেছিলে বটে কিন্তু আমায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করছিলে। কিন্তু আজ আমি তা জেনেছি, বুঝেছি এবং তোমার সৃষ্ট এই নারী আমায় বুঝিয়েছে যে প্রেম ছাড়া জীবন মরুভূমি—নিরবলম্ব—"

তিরস্কার করিয়া বলিলাম—"কিন্তু আমার নিষেধ তুমি শুন্‌লে না কেন?"

"কি করে শুনি—আমি জানতাম না বটে কিন্তু প্রকৃতিকে তুমি লঙ্ঘন করবে কি করে?"

"কিন্তু প্রকৃতির এই খেয়ালটা যে একটা ব্যাধি।"

বহ্নি এবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"হে গ্রন্থকার—নিজের ব্যর্থতায় প্রেমকে অপমান করতে নাই।"

ক্রুদ্ধ হইলাম এই যুবতীর কথা শুনিয়া, বলিলাম—"বাজে কথা ছাড়—আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী তোমাদের চলতে হবে—নতুবা আমি বাধা দেব।"

ভাস্কর হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল—"বাধা দেবে তো তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে না—বাধা দেবে ত' আমি পঙ্গু হয়ে যাব—কারণ এখন বুঝতে পাচ্ছি যে প্রেমহীন জীবন দুর্ব্বিসহ।"

"তবু যদি বাধা দিই?"

ভাস্কর বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল—"আর বাধা দেবার তোমার শক্তি কোথায়? একবার অমৃত পান করলে তার মৃত্যু কোথায়? আমি অমৃত পান করেছি—আমি এখন দুর্জ্জয়—আমায় বাধা দেবে কোন্ শক্তি? আমার কাজ সুরু হয়েছে—"

তবু অনুরোধের সুরে বলিলাম—"তবু আমার মিনতি, হে নায়ক, প্রেমকে পরিহার করো—অতিমানবের এ দুর্ব্বলতা সাজে না—"

ভাস্কর সগর্জ্জনে বলিল—"কিন্তু হে লেখক, অতিমানবকে প্রথমে হতে হবে যথার্থ মানব—"

বহ্নি হঠাৎ আমার দিকে আগাইয়া আসিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রেমে আপনি দুঃখ পেয়েছেন জানি, কিন্তু সমুদ্র মন্থনে ত' খালি অমৃতই উঠে না, বিষও উঠে। আমাদের ভাগ্যে অমৃত উঠেছে—আপনার ভাগ্যে বিষ—তবুও সত্যি করে বলুন ত,' প্রেমের চেয়ে মধুর কি আর কিছু আছে ?"

কি করিয়া অস্বীকার করি ? দেবী আমাকে ভালবাসে না, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসি, একথা ভাবিতেও যে আনন্দ পাই, তাহা ত' মিথ্যা নয়।

বহ্নি বলিল, "একবার ভাবুন দেখি, যদি দেবী আপনাকে ভালবাসে তবে এই প্রেম কি ব্যাধি থাকবে ?"

মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, না।

বহ্নি বলিল, "তাহলে আমাদের প্রেমও ব্যাধি নয়, আমি যেমন ভাস্করকে ভালবাসি সেও আমাকে ভালবাসে—"

ভাস্কর বহ্নির হাত ধরিয়া বলিল—"অতএব হে রূপসী নায়িকা—লেখকের অযৌক্তিক তর্কের অবসানের চিহ্নস্বরূপ আমায় তোমার বাঁকা ঠোঁটের রক্তপ্রলেপের স্বাদ গ্রহণ এবাব করতে দাও—"

বহ্নি মাথা দুলাইয়া বলিল, "কিন্তু লেখক রয়েছেন যে—"

"তাতে কি মূর্খ বালিকা, লেখকেরা রূপকথার ভগবানের মত অদৃশ্য হলেও আমাদের সব কিছুই তাহাদের নজরে পড়বে। বরঞ্চ এস ওঁকেই সাক্ষী মেনে আমার প্রার্থনা পূরণ কর।"

বহ্নি হাসিয়া তাহার ওষ্ঠদ্বয় তুলিয়া ধরিল ভাস্করের দিকে। যেন সূর্য্যমুখী ও সূর্য্য।

নিঃশব্দে তাহা দেখিলাম। মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছি। আমার নায়ক নায়িকার কাছে আমি পরাজিত। কিন্তু পরাজয়ে লজ্জা নাই। সত্যই প্রেমের চেয়ে বড় মানবজীবনে আর কিছু নাই। চেষ্টা করিয়াছিলাম অতিমানবের প্রেমহীন জীবনের চিত্র আঁকিতে কিন্তু আমার ফাঁকিতে অতিমানব ভ্রান্ত হয় নাই, সে নিজের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। কিন্তু হায়, আমার জীবনে প্রেম যেন শুষ্ক ও উত্তপ্ত মরুভূমি।

"ভাস্কর—"

ভাস্কর মুখ তুলিল।

বাহিরের দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে যেন ডাকিতেছে।

"কে ?"—ভাস্কর প্রশ্ন করিল।

"আমি—রামচরণ—"

"এখানে আয়—"

রামচরণ আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি খবর ?"

"আজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ওখানে মিটিংএর কথা বলতে কেষ্ট গিয়েছিল। তাকে বাইরে দেখতে না পেয়ে সে ভেতরের ঘরে গিয়ে ডাকতেই—ত্রৈলোক্য এসে তাকে বললে,—"ব্যাটা ডোম—তোদের দলে মিশেছি বলেই কি ঘরের ভেতর এসে জাত মারবি ?"

হঠাৎ ভাস্করের সমস্ত দেহ নিশ্চল প্রস্তর মুর্ত্তির মত হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, মস্তকের দীর্ঘ কেশরাশি যেন সহস্র ক্রুদ্ধভুজঙ্গের উদ্যত ফণার মত কুটিল হইয়া উঠিল এবং তাহার দুই চোখে কোটী সূর্য্যের প্রাখর্য্য জ্বলিতে লাগিল। রুদ্রের আবির্ভাব ঘটিল।

"বটে !"—সে একবার অস্ফুটস্বরে দাতে দাঁত চাপিয়া বলিল—"কিন্তু কেন সে দলে মিশেছিল, ভেবেছিলাম সব ধুয়ে মুছে যাবে একদিন

—কিন্তু রক্তপাত বিনা যে পথ সুগম হবে না তা আমি জানতাম—"

বহ্নি এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ সে ভাস্করের নিকটে আসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তুমি এখনি যাও, নির্ম্মমতায় তুমি এখন মুর্ত্তিমান কৃতান্ত হও। হে অতিমানব আমিও ব্রাহ্মণকন্যা, কিন্তু মানুষের স্পর্শে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হয় এই বলে মানুষকে অপমান করার অপরাধে মৃত্যু ছাড়া গতি নাই। আমি তোমার প্রেয়সী, কিন্তু আমিও যদি এমন অপরাধ করি তবে আমাকেও তুমি ক্ষমা কর না—"

ভাস্কর এবার বহ্নির দিকে চাহিল, পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ —ক্ষমা নেই—"

দ্রুতপদে সে বাহিরে চলিয়া গেল। পশ্চাতে রামচরণ। তাহার পদভরে মাটি যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে।

বহ্নি দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিষ্পলকনেত্রে দেখিতে লাগিল ভাস্করের গতি।

বড় বড় পা ফেলিয়া ভাস্কর আবছা আলোকিত গলির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম।

বহ্নি আমাকে দেখিতে পাইল।—

"চল্লেন বুঝি?"

"হ্যাঁ—"

বহ্নি আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া হাসিল, পরে বলিল, "একটা কথা বলছি—শুনবেন?"

"বল—"

"নারীকে জয় করা যায় কেবল পৌরুষ দিয়ে। পৌরুষ পাশবিক

বল নয়,হৃদয়ের সমস্ত সদ্‌বৃত্তির সহিত দুর্জ্জয় বিশ্বাস আর সাহস। আপনার সব গুণ আছে কিন্তু সাহস আর বিশ্বাস নেই।"

ভাবিয়া মাথা নাড়িলাম, "হ্যাঁ—ঠিক বলেছ তুমি--তবে কি করব ?"

"এর বেশী মেয়েরা বলতে পারে না—আপনি আমাদের তৈরী করতে পারলেন আর এটা যদি না বোঝেন—তবে আর হা হুতাশ করবেন না।"

লঘুহাস্যে আমায় অপ্রস্তুত করিয়া দিয়া কি একটা গান গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতে গাহিতে বহ্নি ভিতরে চলিয়া গেল।

নিঃশব্দে পথে নামিলাম। নির্জ্জন ও পাথর বাঁধানো গলির পথে আমার জুতার শব্দ উত্থিত হয়। প্রতিপদক্ষেপে মনে মনে বলি—দেবী, দেবী, দেবী। তুমি বড় সুন্দর দেবী। যেন প্রথম বসন্তের প্রথম রক্তপদ্ম।

ভাস্কর অন্ধকারে চলিতে চলিতে একটি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

রামচরণ বলিল—"আমি দাঁড়াব ?"

"দাঁড়া—তোর কাছে কি কোনও অস্ত্র আছে ?"

"যতীনের ওখান থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে আসি ?"

ভাস্কর একটু হাসিল—"আন্‌গে --"

মিনিটখানিক কাটিল।

রামচরণ লোহার একটি দণ্ড লইয়া ফিরিয়া আসিল।

"অন্ধকারে দাঁড়া—আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসি।"

দরজায় করাঘাত করিয়া ভাস্কর ডাকিল—"চক্কোত্তি মশাই—চক্কোত্তি মশাই—"

ভিতর হইতে খন্‌খনে গলা শোনা গেল—"কে বাবা, রাতদুপুরে কেন ডাকৃছ—তুমি কে ?"

"আমি ভাস্কর—দরজা খুলুন—"

ত্রৈলোক্য দরজা খুলিল। শীর্ণ, গৌরবর্ণ, মোটা যজ্ঞোপবীতধার তিলককাটা ব্রাহ্মণ।

"কি দরকার বাবাজী—এই মাত্তর ঘুমুতে যাচ্ছিলাম—"

"একটু বাইরে আসুন—বিশেষ দরকারী কথা আছে—"

"কেন এইখেনেই বল না বাবাজী—বাইরে কি ?"

"আসুন বলছি"—ভাস্কর ধমক দিল।

"আচ্ছা চল—"

ত্রৈলোক্যকে লইয়া ভাস্কর পাশের মাঠটার দিকে চলিল। পশ্চাতে রামচরণ।

খানিকক্ষণ চলিবার পর ত্রৈলোক্য হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল—"আরে এযে মাঠটায় পৌঁছে গেলাম, যা বলবার এইখেনেই বল না বাবাজী—"

"আর একটু চলুন—"

মাঠ।

তাহারা থামিল।

রামচরণকে দেখিয়া ত্রৈলোক্য একটু শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—"ও আবার সঙ্গে কেন ?

"ওর হাতে অস্ত্র আছে।"

"কিসের—এ্যা ?"—ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠে ভয়।

"বলছি—ওরে রামচরণ ডাণ্ডাটা দে ত—"

"একি বাবাজী—কি করবে ?"

"আজ আপনি যুগযুগান্তের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মত মানুষকে যে অপমান করেচেন, তার বিচার করব।"

"মানে ?"—চক্রবর্ত্তী ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"মানে আপনি দলে মিশেছেন বলে আগেই বিচার করতে হল।

ভেবেছিলাম আমাদের দলে যারা মিশবে তারা কুসংস্কারমুক্ত হবেই, কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। রক্তপাত ব্যতীত তা দূর করা যায় না কারণ মৃত্যু ও রক্ত যুক্তির চেয়ে বড়। আপনার সংস্কার দূর হয় নি, বিষাক্ত ব্যাধির মত আপনার ব্রহ্মণ্যগর্ব্বটা সংক্রামক ; তাতে আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হতে পারে—তাই সে ব্যাধিটা আজ দূর করব—"

"তা—তা—আমায় কি করবে তুমি ?—"

"হে ব্রাহ্মণ দেবতা—তোমার শক্তি অসীম সন্দেহ নেই। তোমাদের ভগবানকে তুমি পদাঘাত কর বটে—কিন্তু মানুষকে পদাঘাত করার যে ধৃষ্টতা তোমাদের অস্তিত্বহীন দেবতাদেরও শোনা যায়নি—তার শাস্তি আজ নির্ম্মমভাবে আমিও মানুষ বলে তোমায় দেব। মানুষ হিসেবে—পুরুষ হিসেবে—তোমার যদি কোন শক্তি থাকে তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। নীচতা ও মনুষ্যত্বের অপমানকে আমি সই না, তার জন্য রক্তপাত করায় আমি লজ্জা পাই না, ভয় পাই না। যদি শক্তিতে না কুলায় তবে ডাক ব্রাহ্মণ তোমার তেত্রিশ কোটী দেবতাকে—আর পার যদি আমায় ভস্ম কর। আজ তোমার নিষ্কৃতি নেই"—তাহার দুচোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়ে।

লোহার ডাণ্ডা দিয়া ভাস্কর ত্রৈলোক্যের মস্তকে আঘাত করিল। মস্তিষ্ক চূর্ণ হইয়া ঘিলু মিশ্রিত রক্তের স্রোত নামিল ; আর সেই অবস্থাতে চক্রবর্ত্তী তাহার অন্তিম চীৎকারে ভগবানকে না ডাকিয়া মানুষকেই ডাকিয়া বলিল—"কে আছ—আমায় বাঁচাও—"

কিন্তু আর বলিতে হইল না। পরের আঘাতে সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। তবুও ভাস্কর থামে না, সমানে সে আঘাত করিয়া চলিল, ত্রৈলোক্যের দেহের চেহারা বদলাইয়া গেল। রক্তমাংসের একটি চূর্ণীকৃত পিণ্ড।

উষ্ণ রক্তের গন্ধে ভারাক্রান্ত বায়ুকে সজোরে টানিয়া লইয়া ভাস্কর বলিল—"রামচরণ, দেখলি—ভগবান একে বাঁচাল না—"

রামচরণ হাসিল।

মৃত ব্রাহ্মণের রক্ত ভাস্করের হাতে, মুখে, চোখে লাগিয়াছে, তাহা ঘৃণার সহিত মুছিতে মুছিতে ভাস্কর আবার বলিল—"রামচরণ, আজ ভাল করে চান করিস, এই কলঙ্কিত রক্তের চিহ্ন যেন শরীরে না থাকে, এই রক্ত মনুষ্যত্বকে অবমাননাকারী ব্রহ্মণ্যগর্ব্বের প্রতীক—"

মৃত্যুর মত ঘন কালো আকাশের বুকে খড়্গাধারী কালপুরুষ নক্ষত্রটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে।

দিন কাটে। একজায়গার ধূলা বায়ুবেগে অন্যত্র জমা হয়, মাটির বুকে নূতন ঘাস জন্মায় আবার মরে। সূর্য্য ওঠে আর অস্ত যায়, মানুষ খায়দায় কাজ করে আর ঘুমায়, দিন কাটে, দিন কাটে। আমিও ঘুরি, একবার যোগেশদা, একবার এ অফিসের বড়বাবু, ও অফিসের ম্যানেজার, প্রত্যেকের নিকট চাক্‌রীর উমেদারী করি। কিন্তু কিছুই হয় না। ক্লান্তপদে বাড়ী ফিরিয়া গৌরীর বাড়ীতে সলজ্জচিত্তে আহার গ্রহণ করি, দেবীর কথা ভাবি আর সময় কাটে, সময় কাটে—

"স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি ;
অবিরাম অশ্বক্ষুর ধ্বনি
কাল-প্রহরীর।
—কতদূর হতে ভেসে আসে
নিভায়ে নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
কত পথ মুছে মুছে,

চির মৌন হিম্-রাত্রি বিছায়ে বিছায়ে,
স্মৃষ্টির ফসল তোলা নিঃশেষিত
নক্ষত্রের প্রান্তরে প্রান্তরে।
সে দুঃসহ ধ্বনি হ'তে কোথা পরিত্রাণ ?
ঘুম কই ?"

রাত্রি বেলায় অন্ধকার বিছানায় বসিয়া ভাবি ঘুম আসে না কেন ? উত্তরে দেবীর মুখ ভাসিয়া উঠে। গোল একটি মুখ, একটি ঈষৎ খর্ব্ব নাক, দুইটি পাতলা ঠোঁট, ললাটে একটি অর্দ্ধচন্দ্রের টিপ, আলুলায়িত কেশদাম আর দুইটি নিমীলিত নয়নের কোণে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা। ঘুম কই ?

শুক্রবার।

শরীরটা ভাল লাগিতেছিল না। জ্বর জ্বর হইয়াছে। বাড়ীতেই বসিয়া ছিলাম।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের বিদায়কালীন আয়োজন আকাশের বুকে দেখা যাইতেছে। বাহিরের গাছপালায় তাহার ছায়া।

ভাবিতেছিলাম। আজ দেবীর বাড়ীর ওদিক দিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম যে তাহাদের বাড়ীতে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছে। বোধ হয় আত্মীয়-স্বজন। দেখিয়া সভয়ে মনে পড়িল যে আর তিনদিন পরে দেবীর বিবাহ। পুরাতন ক্ষতটা জ্বলিতেছে।

ভাবি—কেমন ভাবে মাথা তুলিব—কেমন করিয়া সমস্ত দুঃখ আর ব্যর্থতার স্তূপ ঠেলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইব। কিন্তু কি হইবে তাহা করিয়া ? তাহার অপেক্ষা মৃত্যু কি ভাল নয় ?

শাড়ীর খস্‌খস্‌ আওয়াজ, আর চুড়ীর মৃদু টুং টুং শব্দ। চাহিলাম দেবী।

একি স্বপ্ন!

না, সত্য। কিন্তু কেন আসিয়াছে সে?

শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম—"বোস দেবী—"

দেবী বসিল, ইতস্ততঃ একবার চাহিয়া বলিল—"উঃ—কি ধুলো জমেছে—"

মাথা নাড়িলাম—হ্যাঁ, কিন্তু কি করব, মনেও যে ধুলো জমেছে—"

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"একা এসেছ ?"—হাসিলাম—"আজ বাদে কাল তোমার বিয়ে—আমার এখানে আসতে ভয় পেলে না ?"

"ভয়! কেন ?—সে তাহার দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে আমার উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"তোমার কাছে আমার কোন ভয় নেই—আর একা আসিনি, খোকাকে নিয়ে গৌরীদের ওখানে এসেছি—সেই ফাঁকে এখানে চলে এলাম—তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছিল—"

"ওঃ—তা বেশ করেছ—"

"তোমায় অনেকদিন দেখতে পাই না, আমাদের বাড়ী তুমি যাওনা কেন আজকাল ?"

না যাওয়ার কারণ জানাইবার ইচ্ছা হয় না, উত্তরে মিথ্যা কথার সৃষ্টি করি—"অনেক কাজ আজকাল—তাই—"

দেবীর সহিত হঠাৎ চোখাচোখী হয়, দেবী একাগ্রমনে আমার মধ্যে কি যেন দেখিতেছে। সে চোখ ফিরাইল। আমার সারাদেহে এইবার একটা জ্বালা আরম্ভ হইল। স্তব্ধগতি ও উত্তপ্ত বায়ুস্তরের মধ্যে যেমন অবস্থা হয় তেমনি।

ঘরের ভিতর একটা নিঃশব্দতা ঘনাইয়া আসিতেছে। ক্রমে সেটা অসহ্য বোধ হয়—ভিতরের অবরুদ্ধ জ্বালাটির প্রকোপ তাহাতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কেন আসিয়াছে দেবী ?

দেবী কি যেন ভাবিতেছে।

একটু হাসিয়া বলিলাম- "পরশু তোমার বিয়ে দেবী—"

"হ্যাঁ"—তাহার কণ্ঠে হতাশামিশ্রিত নিরানন্দের আভাষ পাইলাম।

"এবার তবে ভুলের পালা। দিন কাটবে—তোমার নূতন সংসারে নূতন নূতন শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুমিও একটু একটু করে ভুলবে আমাকে—আমাদের। অনেকদিন পরে যদি দেখা হয়, তখন হয়ত চিনতেই পারবে না, দরোয়ানটাকে ডেকে বলবে—'রামদীন্, ই কৌন হ্যায় ?" সবিনয়ে হয়ত বলব—"আমি—আমি সাহিত্যিক নবেন্দু—।' ভুরুটা একটু কুঁচকে আমার মলিন পরিচ্ছদ আর কদর্য্য চেহারার দিকে তাকিয়ে হয়ত বলবে—"কই—চিন্‌তে ত পারছি না—"

দেবী মৃদুকণ্ঠে হাসিল, "তারপর ?" তাহার চোখে একটি করুণতাও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একদিন এইরকম দেখিয়াছিলাম।

"তারপর দেবী ?—তারপর তুমি হয়ত বলবে"—"ওঃ—তা যাই হোক —আপুনি বসুন'—ভেতরে গিয়ে নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে হয়ত তোমার বেয়ারাকে বলবে চা আনতে আর সেই অবসরে আমি আবার পথের ধূলায় নেমে যাব।"

"থাম, থাম, তুমি সাহিত্যিক—সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ কথা বলতে পার, শুনতেও ভাল লাগে—কিন্তু কথাগুলো নিছক কল্পনাবিলাসের উদাহরণ মাত্র—ওতে সত্য নেই। সত্যি কথা তুমি শুন্‌তে চাও তো শোনো— বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। মানুষ সহজে কিছু ভোলে না; যারা তা বলে তারা ভাণ করে বলে। তোমার ভয় নেই—তোমায় মনে

থাকবে চিরদিন। মরণ যখন আসবে তখন তোমায় ডেকে প্রমাণ করিয়ে দেব যে তোমার আসন আমার হৃদয়ে কত সুপ্রতিষ্ঠ।"

তাহার দিকে চাহিয়া তাহার মৃদুকণ্ঠের আওয়াজে, বিষণ্ণ নাটকীয় ভঙ্গীতে হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া গেলাম। এই নারী আমায় ফাঁকি দিয়া অপরের হইবে? মাথার মধ্যে মন শতধা হইয়া শতকণ্ঠে প্রশ্ন করিতে লাগিল—কি করিবে, কি করিবে? হঠাৎ ক্রোধ হয়—দেবীর গম্ভীর, সংযত, মুখের দিকে চাহিয়া ক্রোধে জ্বলিতে থাকি। না, দেবীকে আজ অপমান করিব। অপমান নয়, অধিকার। বঙ্কির কথা মনে পড়িল।

দ্রুতপদে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া তাহাকে হঠাৎ কঠিন হস্তে ধরিয়া বক্ষে টানিয়া লইলাম—তাহার দুর্ব্বল উত্তপ্ত হৃদয়ের ধ্বনি আমার বক্ষে ধ্বনিত হইল—তারপরে যে অগ্নিজ্বালায় নিরন্তর ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছি—সেই জ্বালা আমার দুই শুষ্ক উত্তপ্ত ওষ্ঠের ভিতর দিয়া তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের উপর অঙ্কিত করিয়া দিলাম।

তারপরে যখন ধমনীতে নামিল খানিকটা প্রশান্তি, তখন তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া চাহিলাম। থরথর করিয়া তাহার সারা সুঠাম দেহ ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত লতার মত কাঁপিতেছে, অঞ্চল লুটাইয়া পড়িয়াছে ভূতলে, আমার নিষ্পেষণে পীড়িত অজস্র কেশের রাশি আলুলায়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে পৃষ্ঠদেশে, আর সারা মুখমণ্ডলে ক্রোধমিশ্রিত দুঃখের রক্তিমাভা বিদ্যুতের মত খেলা করিতেছে।

আমার দিকে না চাহিয়া সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "কি করলে তুমি?"

চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে একটু হাসিয়া বলিলাম, কিছু না, আমার জ্বালা তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম মাত্র। আমি মেয়েদের ভালবাসি, কিন্তু বিশ্বাস করি না, পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে সহজে সব কথা ভোলে—কিন্তু তা আমি সহ্য করিতে পারি না, পারব না। তুমি যদি

আমায় ভোল দেবী—তবে সে হবে আমার মৃত্যুর সমান। এবার তোমার যদি কিছু করবার থাকে করতে পার—আমার আর কোন ভয় নেই।"

থামিলাম। কক্ষের ভিতর নামিল স্তব্ধতা পীড়াদায়ক স্তব্ধতা।

আরও কিছুক্ষণ কাটিল।

দেবী এইবার আমার দিকে চাহিল, তাহার চোখে জলের ছায়া —"যাই—"

সে দরজার দিকে পা বাড়াইল। সে কাঁপিতেছে। তাহার মনে ঝড় উঠিয়াছে।

ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলাম, "আমার এ ছাড়া উপায় ছিল না দেবী—আমায় মার্জ্জনা করো—"

সে নিরুত্তরে স্খলিতপদে চলিয়া গেল।

অনুসরণ করিতে গিয়া আর পারিলাম না। যেন প্রস্তরে পরিণত হইয়াছি।

দাঁড়াইয়া শূন্য মনে ভাবি। কি ভাবি নিজেই বুঝি না। ঘরের ভিতর দেবীর কেশের আর দেহের মদির গন্ধ—আর আমার ওষ্ঠদ্বয়ে তাহার উষ্ণ ও সুকোমল ওষ্ঠপল্লবের চুম্বনস্মৃতি। আমি কি এই মুহূর্ত্তে মরিব?

ক্রমে বাহিরে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। বাহিরে আম জাম আর তালগাছের পাতার আড়ালে আরম্ভ হয় নিঃশব্দচারী আত্মাদের অভিসার, একফালি বাঁকা চাঁদ ওঠে আকাশে আর পূবের বাতাস প্রবেশ করে আমার ঘরের ভিতর। রাত হয়।

হঠাৎ কাহাদের আগমনে আমার অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও সচেতন হইয়া উঠিল। দেখিলাম—আমার পুরাতন ও বিকৃতমনা নায়কেরা।

গলিতমুখ নিরঞ্জন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আর কেন নবেন্দু, তুমি অনেকদূর এগিয়েছ, অনেক বিষপান করেছ—এবার তুমি মর। কেন

মিথ্যার মোহে পথ ভোল? সবই মায়া—সবই বিদূষকের হাসির মত মিথ্যা আর অর্থহীন—এবার মর—মর—"

ঘরের কোণ হইতে এবার একটি কালো ছায়া আসিয়া আমায় স্পর্শ করিল, কি শীতল তাহার স্পর্শ! তাহার দিকে চাহিলাম—কি অতলস্পর্শী স্বচ্ছ অন্ধকার তাহার দুই চক্ষু-কোটরে!

"কে তুমি?"

"আমি মৃত্যু—"

"কি চাই?"

"তোমায় মুক্তি দিতে চাই। আসবে? দুঃখ আর অপমান, বেদনা আর নৈরাশ্যের সমাধি আছে আমার এই নিবিড়কৃষ্ণ বুকে—আসবে?"

জড়িতস্বরে নীলকান্ত বলিল—"মূর্খ লেখক, এস আমার সাথে—পথের ধূলায়, না তো কোনও নির্জ্জন নদীর তীরে, আমার মতির মত কোনও একটি মেয়েকে ভালবাস—জীবনকে পরিপূর্ণ কর। জীবনের বড় ধর্ম্ম—বেঁচে থাকা—সে যে ভাবেই হোক—"

ঘরের ভিতর এবার সূর্য্যের আলো দেখা দিল। ভাস্কর আসিল। পুরাতন নায়কেরা আর মৃত্যু মৃদুকণ্ঠে অসন্তোষের ধ্বনি তুলিল।

ভাস্কর আসিয়া আমায় ঝাঁকুনি দিল—"লেখক, প্রকৃতিস্থ হও। এই পৃথিবীর সবই সত্য, জীবনের ধর্ম্ম বাঁচা—কিন্তু সুন্দরভাবে বাঁচা। শান্তি মৃত্যুতে পাওয়া যায় না—তা পাওয়া যায় কেবল কর্ম্মে—"

মৃত্যু, মায়াবাদী আর শ্মশানবৈরাগী অদৃশ্য হইল।

ভা র বলিতে লাগিল, জীবনে ব্যর্থতা আসলে ভয় পেয়ো না বন্ধু—সকলকে অতিক্রম করে তুমি অটলভাবে স্থির থাক। যদি তুমি ভাঙ্গ—তবে আমরা কোথায়? আর তোমাদের জীবনে দুঃখের অভিশাপ ত, থাকবেই কিন্তু তাতে মুষড়ে পড়লে চলবে না। তোমাদের জীবন আত্মত্যাগের জীবন

—প্রেম নেই, আশা নেই—কেবল আছে স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন থেকে আমরা জন্মে হব বাস্তব। আমাদের আবির্ভাবকে, ভাবী যুগের সাফল্যকে যদি তুমি একান্তই চাও লেখক, তবে ছাড় এসব বাঁধন, ত্যাগ কর এ পাখীর বাসা। আজ থেকে গেয়ে বেড়াও তোমার স্বপ্নের গান—দিকে দিকে—"

ঠিক। মনস্থির হইয়া গেল। যাযাবর পাখীর ডানার শব্দ ভাসে আকাশের গায়ে।

অনেকক্ষণ কাটিল।

আর বসিয়া থাকিতে পারি না! মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। দেহের উত্তাপে বুঝিলাম জ্বর বাড়িতেছে। শুইয়া পড়িলাম। খানিক্ষণ পরে তন্দ্রার ভাবটা ব্যাহত হয়। কে যেন ডাকিতেছে।

"বাবু—"

গৌরীদের চাকর।

বলিলাম—"রামু—আমার জ্বর হয়েছে—আজ খেতে যাব না।"

"ওঃ—আচ্ছা—"

রামু চলিয়া গেল।

মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। মাথার শিরাগুলি দপ্ দপ্ করে, চোখের সামনে মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের আবর্ত্ত; বুকের মাঝে হৃদ্‌পিণ্ডটার ধুক্‌ধুকানির সহিত আমার সাগ্নিক আত্মা জপিতেছে দেবী—দেবী—দেবী—।

কিন্তু না—আর নয়। এবার পাখী উড়িবে। দিগন্তের ডাক আসিয়াছে।

দ্রুত পদধ্বনি।

"মেজ্‌দা"—গৌরী আসিল।

উত্তর দিতে গিয়া শুষ্ককণ্ঠে কথা আটকাইয়া যায়।

"উঃ—অন্ধকারে শুয়ে আছ? ওরে রামু—লণ্ঠনটা নিয়ে আয় তো—"

লণ্ঠন আসিল। সুচ্যগ্রফলার মত আলোর ঝলক চোখে বিঁধে।

ললাটে হাত দিয়া গৌরী ভয় পাইল—"একি! জ্বরে যে পুড়ে যাচ্ছ মেজদা—"

হাসিলাম—হ্যাঁ—এবার একেবারে পুড়বার পালা যে ভাই—"

গৌরীর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, "ছিঃ ভাই মেজদা—পাগলামি করো না, জ্বর হয়েছে—সেরে যাবে—"

"না গৌরী, আর না—"

"চুপ কর তুমি। তোমরা পুরুষজাতটা এমনি মেজদা—তোমাদের যত ভাল বলবো ততই অবাধ্যের মত মাথা নেড়ে প্রমাণ কর্ত্তে বসবে যে তা নও—"

চুপ করিলাম।

"আজ আর ওষুধ দিয়ে কি হবে—কালকে ওষুধ খেও। যাই, বার্লি নিয়ে আসি—"

"না ভাই, কিচ্ছু খাব না—"

"না—না—না খেলে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে—"

"না, কথা শোন গৌরী—কাল খাব, কেমন?"

গৌরী একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু ভাবিয়া বলিল,—"আচ্ছা—"

"এবার বাড়ী যাও—"

"দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালিয়ে রাখি—"

"না—বাতি সহ্য হচ্ছে না—ও থাক—"

"রাত্তিরে দরকার পড়লে ডেকো—রামু বাইরে শোবেখ'ন।"

"কেন কষ্ট করছ, দরকার হবে না।"

"না—ও থাকবে—সবটাতে গোয়ার্ত্তুমী ক'রো না।"

"আচ্ছা ভাই—"

"হাত পা খুব ব্যথা কচ্ছে—না ?"

"হ্যাঁ—"

"টিপে দিই ?"

"তাহলে এখুনি চলে যাব।"

গৌরী ম্লান হাসিল—"কি পাগল তুমি—উঃ—" হঠাৎ আমার মাথায় হাত রাখিয়া ভারি স্নেহের সহিত বলিল—"শিগ্‌গীর ভাল হয়ে ওঠ মেজ্‌দা—পরশু দিন দেবীদি'র বিয়ে, জানত ?"

"এ্যাঁ—ওঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ জানি।"

"এবার তবে আসি—"

"এসো ভাই—"

গৌরী চলিয়া গেল।

অন্ধকার।

অন্ধকারে ছবি ভাসে। বর ও বধূর। দেবীর মুখে চন্দনের ফোঁটা, কেশে ফুলের মালা, মাথায় মুকুট—কিন্তু তবু—না। 'যাবার সময় হোল বিহঙ্গের'—

রাত্রি কাটে—কিন্তু ঘুম আসে না। দেবীর কি প্রাণ আছে ?

পরদিন।

জ্বর কমে নাই।

দিনের বেলায় তিনবার গৌরী আসিয়া আমার পরিচর্য্যা করিয়া গেল। তাহার বাবা মা দেখিয়া গেলেন, ঔষধ দিয়া গেলেন। আমার

নিজের, মা বাবা'র কথা তাহাদের দেখিয়া মনে পড়ে। "সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।—"

বৈকাল পার হইয়া আবার সন্ধ্যার দিকে সময়ের রথ চলিল। সারাদিন আজ বৈশাখের এলোমেলো বাতাস বহিয়াছে—এখনও বহিতেছে।

সন্ধ্যার সময় দূরের কোন মন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির রেশ ভাসিয়া আসিল। ভগবান কি আছে? না। আছে কেবল এক দুর্নিবার নিয়তি—সে অন্ধ, কুটিল। দুর্লঙ্ঘ্য তাহার গতি—হৃদয় হীন। ভগবান নাই।

কাণে ভাসিয়া আসে ভাস্করের গর্জ্জন—"ভাঙ্গ এসব মন্দির—এ মানুষের ভয়ের চিহ্ন। ভাঙ্গ তোমাদের ঐ সব পাথরের মূর্ত্তি—যাতে প্রাণ নেই—"

মন্দিরগামী লোকদের সম্মুখে ভাস্কর আর তাহার দল গিয়া বলিতেছে।

একজন বৃদ্ধ বলিল—"ছিঃ বাবা—অমন পাপ কথা উচ্চারণ ক'র না—"

ভাস্করের চোখ জ্বলে—"পাপ কথা নয় হে স্থবির, সত্যকথা! ভগবান নাই—আছে কেবল মানুষ আর তার কর্ম্ম। ভগবান যদি থাকত তবে তোমাদের এ দুঃখ কেন?"

বৃদ্ধ বলিল—"মানুষ নিজের কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে—"

"তবে ভগবানের কাছে মাথা খোঁড় কেন?"

"তিনি দয়াময়—যদি তাতে কর্ম্মের খণ্ডন হয় এইজন্য—"

"হে দুর্ব্বল মানুষ স্তব্ধ হও—তুমি জান না যে তোমার দয়াময় আজ পর্য্যন্ত দুঃখী আর দরিদ্রের দুঃখ মোচন করতে পারে নি। দয়াময়! যে নেই তার দয়া থাকবে কোত্থেকে? আফিংয়ের নেশা ছাড় কাপুরুষের দল। মানুষের আদিম যুগের রচনা এই ভগবান মিথ্যা। দয়াময়! যদি তোমাদর এই ভগবান থাকত তবে যুগযুগান্তের অসহায়দের কাতর ক্রন্দনে

নিশ্চয়ই সে সাড়া দিত। যে সব জটাধারী তার স্থিতির নজির দেয়—তারা মিথ্যা বোঝে—কারণ তারা মানুষের বিচিত্র মনের সাহায্যে কতকগুলি সুন্দর ছবি দেখে মায়াচ্ছন্ন হয়েছে। তবু যদি থাকে তোমার ভগবান—সে আসুক—দাঁড়াক এসে সামনে—বদলাক মানুষের এই নারকীয় অবস্থা—"

বৃদ্ধ বলিল—"আসবে—আসবে—হে নাস্তিক তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে—"

ভাস্কর হাসিয়া উঠিল—"হাঃ—হাঃ হাঃ—"

বৈশাখের বাতাসেতে সে হাসি দিগদিগন্তরে ভাসিয়া যায়।

সময় কাটে। আকাশে নক্ষত্রদের হৃদপিণ্ডগুলি ধুকধুক্ করিতেছে।

ভাবি। ঠিক—মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের চেয়েও বড় একটা জীবন আছে। বিশেষ শিল্পীদের। আমায় যাইতেই হইবে, সব বাঁধন ছিঁড়িতেই হইবে। কোন বাধা—কোন প্রলোভনে আর ভুলিব না। আমি যদি ভুলি—যদি ভ্রান্ত হই—তবে আমার নায়কের মৃত্যু ঘটিবে। না, তাহা করিলে চলিবে না। হ্যাঁ—আজই যাইব? জ্বর তাহাতে কি। যে আগুন জ্বালাইয়াছি—তাহার শিখাকে চির প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে। প্রতি মানুষকে জানাইতে হইবে আমার স্বষ্ট অতিমানবের আবির্ভাবের কথা। সকল দুঃখী দরিদ্রদের বলিতে হইবে যে ভয় নাই—তোমাদের দিন আসিতেছে।

"ভাই সব"—অগণিত লোক সমুদ্রের মাঝে ভাস্কর বলিতেছে—"পৃথিবীতে হিন্দু মুসলমান, জার্ম্মান আর ইংরাজ, সাদা বা কাল বলিয়া কোন জাতি নাই, পৃথিবীতে দুইটি জাতি—ধনী আর দরিদ্র, অত্যাচারী ও নির্য্যাতিত, ভোগী আর বঞ্চিত। একদল মুষ্টিমেয় লোক আর এক বিরাট দলকে নিষ্পেষণ করে। কিন্তু চিরদিন কি এমনি কাটিবে? না। ভাই সব, একসাথে এসো—মানুষেরা অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক পরীক্ষা করেছে,

সবই নিষ্ফল হয়েছে—কিন্তু এবারের শেষ চেষ্টায় আমরা হব জয়ী। আমাদের মধ্যে জাতি নেই, বর্ণ নেই, শ্রেণী নেই—এখানে সব এক। বিশ্বাস কর আমার কথা—আমি বলছি যে সূর্য্য উঠ্‌লে যেমন দিন হয়—. তেমনি আগামী বিপ্লবের পরে অত্যাচারী মানুষেরা যখন নিশ্চিহ্ন হবে তখন নূতন এক সাম্যের পৃথিবী রচিত হবে—"

সহস্র কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আকাশে কাঁপে—"হ্যাঁ—এক হও—ভাই সব সূর্য্য উঠ্‌লেই ত' দিন হয়—"

তারপরে ভাস্কর আবার কোথায় যেন যায়—বুঝিতে পারি না—পীড়িত মনে তাহার দ্রুত পদক্ষেপের অনুসরণ করিতে পারি না। দুরন্ত অশ্বের মত সে চলিয়াছে, কখনও এর দ্বারে কখনও ওর দ্বারে, প্রতি লোককে সে শুনাইয়া চলিয়াছে—মানুষের চরম স্বপ্নের কথা।

"ঘুমিয়েছ ?"

বাতিটা উস্কাইয়া দিলাম। দেবী আসিয়াছে। বিস্ময়ে কথা খুঁজিয়া পাই না।

সে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার দিকে ক্ষণকাল জ্বলন্ত স্থির দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল পরে একটু হাসিয়া বলিল—"আজকেও কালকের মত গৌরীদের বাড়ী বেড়াতে আসার ভাণ করে এসেছি—"

হাসিয়া বলিলাম—তার জন্য তোমায় কোটী ধন্যবাদ দেবী, কিন্তু কেন এসেছ ?"

সে উত্তর দিল না, কেবল মাথা নীচু করিল।

বলিলাম—"কালকের অপমান তুমি তাহলে ভোলান ? নূতন করে আবার বুঝি আমায় তিরস্কার করতে এসেছ ?'

এবারও সে উত্তর দিল না। একই ভাবে নিশ্চল ও নিঃশব্দ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে দেখিতে থাকি। অস্ত শেষ দিন। আকাশে যাযাবর পাখীদের ডানার শব্দ—তাহারা ডাকিতেছে। দেবীকে দেখী। কালো রংয়ের ব্লাউজের উপর সে একটি কালো রঙের শাড়ী পরিয়াছে। আমার কামনার ছায়া। তন্বী সুঠাম দেহ, দীর্ঘ হস্ত, চম্পক অঙ্গুলি, আর দুইটি স্বপ্নালস ও কাজলে আঁকা চক্ষু। সে যেন একটি সুন্দর কবিতা। ভালবাসি—এই নারীকে আমি ভালবাসি।

ডাকিলাম—"দেবী—"

হঠাৎ সে ত্বরিত গতিতে আসিয়া আমার দেহের উপর লুটাইয় পড়িল, আমার বক্ষের উপর মস্তক রাখিয়া, দুই হস্তে আমাকে কঠিনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলি—"একি দেবী—একি !—"

উঠিয়া বসিলাম।

দেবী একই ভাবে কাঁদে।

"কেন কাঁদছ দেবী—কেন ?"—আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করি।

সে উত্তর দেয় না। তাহার কান্না যেন থামিবে না। আমার বুকের উপর সারা দেহ এলাইয়া দিয়া সে কাঁদে। নীড়হারা সোনালী পাখীর মত মোলায়েম তাহার দেহ, অসহায় তাহার কান্না। তাহার দেহের উষ্ণতায়, তাহার সমুন্নত বক্ষের দ্রুতধ্বনিতে আমার চেতনায় অন্ধকার নামে। কেন কাঁদে দেবী ?

দুই হস্তে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখটি তুলিয়া ধরিলাম। তাহার আলুলায়িত কুন্তল যেন মেঘের পুঞ্জ আর তাহার মুখমণ্ডল যেন আকাশচ্যুত চাঁদ।

"কেন কাঁদ দেবী—কেন ?"

সে এইবার কথা বলিল—"কেন জিজ্ঞাসা কর—তুমি কি বোঝ না—যে ভুল করেছি তারই জন্য কাঁদি—"

"কি ভুল ?"

"তুমি কি অন্ধ ?"

"দেবী—তুমি প্রহেলিকা—তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

দেবী আমার বুকেতে মুখ লুকাইল—"কাল রাত থেকে কি ঝড় যে চলেছে আমার মনে। হঠাৎ মাঝরাতে আবিষ্কার করলাম—যে আমার হৃদয়েতে ত' তোমার আসন ছাড়া আর কারও আসন নেই। লজ্জায় মরে গেলাম, দুঃখে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হল, অন্ধের মত কি করেছি এতদিন, মিথ্যার মোহে তোমায় কেবল কষ্ট দিয়েছি। আমায় মার্জ্জনা কর—"

সহস্র পুষ্পের গন্ধ বুঝি বাতাসে ? গন্ধর্ব্বেরা বুঝি গান গাহিতেছে ? একি অঘটন ? না, অঘটন নয়, পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

"তুমি আমায় ভালবাস দেবী—একি স্বপ্ন না সত্য ?" সুরভিত নিঃশ্বাস পড়ে মুখের উপর। উষ্ণ চুম্বনের রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে আমার মন যেন উন্মাদ হইতে চাহে।

"ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি—"

মনের মাঝে শত তর্ক। দুই দল। এক দল বলে—এইবার নীড় বাঁধ, আর একদল বলে—এই সুখকে ত্যাগ করিতে হইবে—তোমার স্বপ্নকে বাঁচাও। কিন্তু তবু—যতক্ষণ আছি ততক্ষণ যতটুকু পাথেয় পারি সংগ্রহ করিব না কেন ?

আবার দেবীর কণ্ঠ শুনি—"তুমি কথা বলছ না কেন ? তুমি কি আমায় ভালবাস না ?"

উত্তরে তাহার ওষ্ঠে, তাহার চোখে, গালে, কণ্ঠে, বক্ষে, হস্তে—আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে ভালবাসা লুক্কায়িত আছে তাহা অঙ্কিত করি।

সময় কাটে।

সে বলিল—"এবার আমায় নিয়ে চল কোথাও—এখানে থাক্‌লে আমি মরে যাব। পরশু বিয়ে—তার আগে নিয়ে চল কোথাও আমায়—"

"কোথায় ?"

"যেখানে ইচ্ছে—"

ভাবি। কোন্‌টা বড় ? ব্যক্তিগত জীবন না বৃহত্তর জীবন ?

ভাস্করের গলা শুনি কানের পাশে—"এই যুগে তোমাদের দুঃখ পেতেই হবে—হেলায় সব ত্যাগ করতে হবে, নইলে মানুষের মুক্তি নেই—"

কিন্তু মন সাড়া দেয় না—যাহাকে ভালবাসি সে রহিয়াছে বুকের পরে সে দিয়াছে পরিপূর্ণভাবে ধরা—কোথায় যাইব ?

"কথা বলছ না কেন ?"

চেতনা ফিরিয়া পাই।

'এঁ্যা—আচ্ছা সে কালকে হবে—"

"কালকে—কখন যাবে ?"

কি করিব ? মনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চলিয়া যাইব না ভুলিব ? ভাবি। নাই বা হইল বাসা আর সাধারণ জীবনের ভালবাসা। এ জন্মে নাই বা কাটালাম একসাথে। পরজন্মে আবার দেবীকে পাইব। কোথায় যাইবে সে ? সে জন্মজন্মান্তরের জন্য আমার। না আর বন্ধন নয়। বাহিরের ডাক আসিয়াছে। অগণিত নরনারী রহিয়াছে—যাহাদের জীবনে আলো নাই, আশা নাই, সুখ নাই—তাহাদের যে নূতন জীবনের বাণী শোনাইতে হইবে। শিল্পীর কাছে একটি নারীও যেমন পরমপ্রিয় ও সত্য—তেমনি সমস্ত মানবগোষ্ঠী। তা ছাড়া—কোথায় যাইবে দেবী ? কেন এই যাযাবর, হতভাগ্য শিল্পীর ছন্নছাড়া জীবনের পাঁকে পড়িয়া কষ্ট পাইবে ? সে ধনীর কন্যা—সুখে অভ্যস্তা। সে আমায় ভালবাসিয়াছে

তাহাই যথেষ্ট। তাহার বিচ্ছেদ যদি সহ্য করিতে পারি তবে সেও আমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিবে। তাই হোক্, সে থাকুক। দেহে আমার প্রয়োজন নাই, তাহার মন আমার।

"কালকে কখন যাবে ?"

মিথ্যা কথা রচনা করি—"কাল রাত্রে—তুমি বাড়ীতে থেক, আমি রাত ন'টায় যাব—"

"আচ্ছা। কোথায় যাবে বলত, কোলকাতায় ?"

"হ্যাঁ—"

"বেশ, গিয়েই কিন্তু আমাদের বিয়েটা হওয়া চাই—তারপরে বাবাকে চিঠি লিখব—তারপরে—"

ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি সে কল্পনার চোখে দেখে। গৃহ, শান্তি, আমার ভালবাসা আর সুন্দর একটি শিশু।

দুঃখ পাই। চোখে জল আসে, কিন্তু তাহা গোপন করি।

হঠাৎ তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"যদি আজ রাত্রে মরে যাই দেবী ?"

সে আমার মুখে হাতচাপা দিয়া হাসিয়া বলিল "দুষ্ট, কোথাকার—চুপ কর—"

মাথা নাড়িয়া বলিলাম—"না, সত্যি বলছি দেবী। যদি আর আমায় না দেখতে পাও তবে ভুল বুঝ না আমায় আর, আমার ভালবাসায়—"

দেবী হাসিয়া উঠিল—"তোমার বাজে কথা শুনতে গেলে আরও দেরী হবে, এবার তবে আসি—হ্যাঁ—তোমার জন্য একটা মালা এনেছি—

আঁচল খুলিয়া সে একটি ছোট মালা বাহির করিল। মালতী ফুলের মালা। পরম অনুরাগভরে তাহা সে আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। মনে মনে বলিলাম, "আর ভয় নেই—এবার তুমি আমার—"

মালা দিতে আসিয়া হঠাৎ সে আমার দেহের উত্তাপে এইবার চমকিয়া উঠে, "একি! তোমার জ্বর যে ভয়ানক বেড়েছে—"

"বাড়ুক দেবী—তবু যাব। এবার তুমি বাড়ী যাও—নইলে সবাই ভাববেন—"

সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিল—"এবার তুমি ঘুমোও—কেমন?"

"আচ্ছা—"

সে খানিকটা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল—"তাহলে কালকে—রাত ন'টা?"

সম্মানবদনে মিথ্যা কথা বলি—"হ্যাঁ—"

আমার কণ্ঠদেশ আবার সে জড়াইয়া ধরিল; আমার উত্তপ্ত ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিল—"প্রিয়তম—প্রিয়তম—"

আমার আত্মা কাঁদিতেছে।

সে চলিয়া গেল।

কক্ষের ভিতর তাহার দেহের আর ক্লেশের মদির গন্ধ। আমার বক্ষে, ওষ্ঠে, তাহার দেহের উত্তপ্ত স্মৃতি।

সে চলিয়া গেল। সময় কাটে।

এই ভাল। আমার স্বপ্ন আমার ব্যক্তিগত জীবনের [illegible] দুঃখের চেয়েও বড়। হে আকাশ আর নক্ষত্রদল—আমার মধ্যে যে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে তাহা যেন অনির্ব্বাণ হয়।

আরও কিছুক্ষণ কাটিল।

না, আর দেরী নয়। এইবার। থাকুক জ্বর—মরিব না। আমার অনেক কাজ।

ঘরের দিকে চাহিলাম। কিছুই লইবার নাই।

আজ আর দ্বার বন্ধ করিলাম না।

দেহটা দুর্ব্বল—কিন্তু তবু থামিব না।

গৌরীদের বাড়ীতে গেলাম। গৌরীকে না দেখিয়া কেমন করিয়া যাই ?

"গৌরী—"

মাসীমা আমায় দেখিয়া অবাক হইলেন—"একি বাবা—এই জ্বর নিয়ে এসেছ কেন ?"

"ভাল লাগল না মাসীমা—"

"একা একা ত' ভাল লাগবেই না—আচ্ছা তুমি এখানেই শুয়ো—"

"তা না মাসীমা, গৌরীর সঙ্গে একটু গল্প করেই চলে যাব—"

গৌরী আমার গলা শুনিয়া আসিয়া হাজির হইল—"ওমা, কেমন লোক তুমি মেজদা, এই জ্বরগায়ে চলে এসেছ ?"

হাসিলাম—"কোন ভয় নেই ভাই—আমরা সব দধীচি মুনি—"

"চল বিছানায় শোবে চল—"

"কোন দরকার নেই, গৌরী ভাই—"

"কি ?"

"আজ ভারী গান শুনতে ইচ্ছে করছে—একটা শোনাও—"

"এই ত' মুস্কিল কর মেজদা—দাঁড়াও বার্লি নিয়ে আসি—"

"সে পরে বাড়ীতে পাঠিয়েদিও—এখন একটাগান শোনাও আগে—"

"তবে খালি গলাই গাইব বাপু—হারমোনিয়াম ভাল লাগে না—"

"আচ্ছা—"

গৌরী গাহিতে আরম্ভ করিল। কি আশ্চর্য্য! তাহার আত্মা বুঝি আমার যাওয়ার কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

সে গাহিতে লাগিল। তাহার মিষ্টি সুরে কক্ষ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বেহাগের বিরহ।

নিজের কণ্ঠের দিকে চাহিলাম। দেবীর মালা তাহার দেহের কোমলতা লইয়া আমার কণ্ঠ জড়াইয়া আছে।

আমি জয়ী।

গান শেষ হইল।

বলিলাম, "এন্‌কোর—"

গৌরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বসন্তের হাসি।

চোখে জল আসে।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম, "চল্লাম গৌরী— আর যদি দেখা না হয় তবে আমায় ভুলো না ভাই—"

"ইস্—অত বড় বড় কথা থাক—কোথায় যাচ্ছ শুনি?"

"বাড়ী—"

"ওমা—কি ছেলে বাপু তুমি। যাও, বাড়ীতে গিয়ে শোওগে—রামুকে পাঠাব?"

"না—"

"আচ্ছা তুমি যাও, আমি খাবার নিয়ে আসছি—"

সে দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাস্তায় নামিয়া গলির মোড়ে তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলাম। সে একইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যেন একটি ছবি। ভুলিব না এ ছবি। আজিকার দিন আমার জীবনের পরম লাভ। অন্ধকারে একবার নিজের বাড়ীটার দিকে চাহিলাম। মা, দেবী, গৌরী, মাসীমা, জ্যাঠাইমা—সকলের মুখগুলি একে একে চোখের সামনে ভাসিয়া গেল, পরে দেবীর মুখ স্থির হইয়া চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। চিরদিন ভাসিবে।

আর না।

চলার বেগ বাড়াইয়া দিলাম।

ক্রমে সহর দূরে মিলাইয়া গেল, মিলাইয়া গেল আমার অতীত জীবন, ফেলিয়া আসিলাম সব প্রিয়জন—আর ইহ জীবনের সুখ ও শান্তি। দেবী—ক্ষমা করিও, তোমাকে ভুলিব না। জীবনে হয়ত এবার উঠিবে ঝড়, স্বপ্নকে সত্য করিতে এবার হয়ত পথের ধূলা লাগিবে দেহে, তবু তোমাকে ভুলিব না—আমার অর্দ্ধেক আত্মা যে তোমার।

চলিতে থাকি। সময় নাই—

'স্বপ্ন বাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই
সময় নাই—'

চলিতে চলিতে রাত কাটিল, ভোর হইল। ক্রমে ভোরের সূর্য্যালোক মধ্যাহ্নের প্রখরতায় রূপান্তরিত হইল। সহর ছাড়িয়া, গ্রামান্তর হইয়া নির্জ্জন বনভূমির মধ্য দিয়া কতক্ষণ যে চলিয়াছি তাহা খেয়াল করি নাই। জ্বরে আর উত্তেজনায় ভূতগ্রস্তের মত দৈহিক অক্ষমতাকে জয় করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে আর পারিলাম না—থামিলাম। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে, মস্তিষ্কের শিরাগুলি দপ্‌ দপ্‌ করে, দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসহ্য বেদনা, আর যন্ত্রণাদায়ক পীড়িত ক্ষুধার জ্বালা। থামিলাম। দূরে একটি নূতন সহর দেখা যাইতেছে।

ছায়াচ্ছন্ন বনের প্রান্তদেশে, একটী বড় বৃক্ষের নীচে দেহটাকে এলাইয়া দিলাম।

স্তিমিত, ঝাপসা দৃষ্টি দিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ অরণ্যের মধ্যাহ্ন সঙ্গীত শুনি। দূরে দু'একটা বিচরমান গরু আর ছাগল, দু'একজন অদৃশ্য লোকের দূরাগত কণ্ঠধ্বনি বৃক্ষের শাখায় বিশ্রামরত চিলের ডানার শব্দ, কাঠ-

ঠোকরা আর ফিঙে পাখীদের কাকলী, মৃদু বায়ুবেগে উত্থিত শুষ্ক পত্ররাশির ক্ষীণ বিলাপ এবং উপরে—যে সূর্য্যকে আমরা হারাইয়াছি। হ্যাঁ—সুন্দর এই পৃথিবী—

আবার যখন চোখের পরদা তুলিয়া চেতনাকে জাগ্রত করিলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাছের পাতার আড়ালে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিতেছে।

"আরে ঝমরু—এইখেনে বসা যাক্ আজকের মত, কেমন ?"

"হ্যাঁ—"

দেখলাম ছায়ার মত গোটা পাঁচেক পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোক। তাহাদের মলিন, ছিন্ন পোষাক ও ক্ষুধিত আকৃতি দেখিয়া বুঝিলাম যে তাহারা ভিক্ষুক। নিজেদের ঝোলা নামাইয়া আমার অনতিদূরে তাহারা বিশ্রাম করিতে বসিল।

সময় কাটে, নিঃঝুমের মত পড়িয়া থাকি। ভিখারীরা গাছের পাতা প্রভৃতি জড় করিয়া রান্না করে।

হঠাৎ ভিখারীদের মধ্য হইতে কে যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একজন বলিল—"এই পাগ্‌লা, হাসছিস্ কেনে রে ?" যে হাসিতেছিল, সে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"হি হি- এক ফালি চাঁদ আকাশে উঠেছে—হি হি হি—"

"দুর্ শালা—তাতে হাসবার কি আছে রে ?"

"হি হি হি"—পাগল উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিতে থাকে।

আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে মাঝে চন্দ্রালোকের প্রলেপ পড়ে। কল্পনার জগৎ আমার চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হয়। ভাস্কর পা টিপিয়া টিপিয়া কোথায় যেন যাইতেছে !

বহ্নি ঘরের মধ্যে একা বসিয়া কি যেন সেলাই করিতেছিল।

ভাস্কর ডাকিল "এই—"

বহ্নি ইচ্ছা করিয়া উত্তর দেয় না।

"এই রাক্ষসী—"

রাক্ষসী মুখ ফিরাইয়া চোখের বিদ্যুতে ভাস্করকে আহত করিল।

ভাস্কর আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

"কি ব্যাপার, কোথায়?"

"চুপ্—আজ আর কোন কথা নয়, আজ শুধু মুখোমুখী দুজনে বসে সময় কাটাব—তোমার আর আমার স্বপ্নের মালা বদল করব—"

বহ্নি হাসিল।

আমিও হাসি। (আমার কণ্ঠে দেবীর মালা) সানন্দ হাসি। আমার অতিমানব নায়ক-ত' মানুষ।

হঠাৎ ভাস্কর থামিল। সম্মুখে ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল—"হেঁ হেঁ—দেখ বাবাজী—একটা কথা আছে, আমি কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি—"

ভাস্কর হাসিল-"কথাটি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তার আগে আপনাকে বলে দিচ্ছি যে আপনার মেয়েকে আমি ভালবাসি।"

"এঁ্যা! বিস্ময়ে ঘনশ্যাম কথা খুঁজিয়া পায় না।

"হ্যাঁ, অবাক হবেন না—আমি বহ্নিকে বিয়ে করব।"

ঘনশ্যাম লাফাইয়া উঠিল "তুমি! হেঁ হেঁ-বাজে কথা ছাড় বাবাজী—তোমার জাতের ঠিক নেই।"

বহ্নি গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"ও মানুষ—এর চেয়ে বড় পরিচয় মানুষের কি হতে পারে?"

"কি! ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে এই কথা তুই বল্লি?"

ভাস্কর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"আর কোন কথা নয় আমি মানুষ, আমি ভালবাসি এই নারীকে এবং সেও আমাকে ভালবাসে—এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কিছুই নেই, আর হতে পারে না। সুতরাং চল্লাম আমরা দুজনে। আপনার সাধ্য নেই যে আমাদের আটকান—শুনে রাখুন শ্বশুর মশায়—জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বলে কিছুই নেই—ভালবাসায় ত' আরও নেই।"

দৃপ্তপদে সে বহ্নির হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল। ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া ভাবে। কি করবে সে?

একটু পরে সে ডাকিল—"হেঁ হেঁ—ও গিন্নী—"

"কি?" বহ্নির মা প্রবেশ করিল।

মেয়েটা যে গেল—

"কোথায় গেল?"

"ভাস্করের সঙ্গে। ছোঁড়ার জাত জানি না, কুল জানি না—তাকেই হতভাগী বিয়ে করবে!"

বহ্নির মা হাসিল।

"হাস্‌ছ কেন?"

"যুগ বদলেছে, কিন্তু আমরা বদলাইনি—সেই কথা ভেবেই হাস্‌ছি।"

ঘনশ্যাম আবার ভাবিতে লাগিল।

আমিও আবার হাসিলাম। কবে আসিবে সে দিন? সেই বিপ্লবের পর আমার ত্যাগের সমাপ্তি ঘটিবে—আবার দেবীর নিকট ফিরিয়া যাইব? পাইয়াও স্বেচ্ছায় হারাইয়াছি তাহাকে, কারণ দেবীকে যেমন ভালবাসি তেমনি সমগ্র মানবজাতিকেও যে ভালবাসি। আমার ভালবাসার নির্ভীক প্রকাশ তখনই হইবে যখন আমার নায়ক সত্য হইবে।

দেবী। বিবাহের বাঁশীর সুর কি ভাসিয়া আসিতেছে? আজ দেবীর বিবাহের দিন। কি করিল সে? তাহার দেওয়া মালা শুকাইতেছে! তাহাতে কি, শুষ্ক মালার গন্ধটুকু চিরদিন কণ্ঠে থাকিবে। ভালবাসি, দেবী তোমায় ভালবাসি।

রাত্রির নুপুর বাজিতেছে সারা অরণ্যে। ঝমরঝম্ ঝম্ ঝম্— ঝমরঝম্ ঝম্ ঝম্—। নিশীথিনীর কালো কেশ তাহার পৃষ্ঠে আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে দেবীর কেশরাশির মত।

"আরে—ও কে বটে!" একজন ভিখারী বলিল।

বলিলাম—"আমিও ভিখারী।"

লোকটি হাসিল—"তোমার যে গায় জামা আছে গো—"

"না ভাই—আমিও ভিখারী—মানুষের মুক্তির আর সুন্দর জীবনের।"

লোকটি আমার কথা না বুঝিয়া হাসিল।

তাহারা খাইতে বসিল।

ঝমরু বলিল—"আহা, একটু নুন তেল যদি থাকত, তবে পোড়া বেগুনটা আরও সুস্বাদ হত ভাই—"

সকলে হাসিল।

একটি স্ত্রীলোক হাসিয়া কি একটা অশ্লীল উক্তি করিল। আবার হাসির রোল উঠিল।

ঝমরু হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "হাসছ কেনে?"

একজন বলিল—"হাসব না, ভিখারীর অত সাধ কেনে?"

ঝমরু গম্ভীরস্বরে মাথাটা ঈষৎ নাড়িয়া বলিল—"কিন্তু আমাদের দিন বদলাবে—তোরা দেখিস, চিরদিনই আমরা এই দুঃখ সহ্য করিব না।"

ভাস্করের দীর্ঘ দেহ—ভিখারীদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ ভাই—তোমাদের দিন আসছে।

এক হও ভাই সব—তোমাদের ছেঁড়া ঝুলির দিন শেষ. হয়ে আসছে—”

তাহারা আমার দিকে বিস্ময়ে ও কৌতুহলের সহিত চাহিল।

বলিলাম—“মনে রেখো ভাই সব—সব মানুষ সমান। কেন একজন দুঃখ ভোগ করবে, রাস্তার ধুলোয় থাকবে আর একজন থাকবে সুখে? মনে রেখো—পৃথিবী তোমাদেরও।”

ভাস্করের দেহ আরও দীর্ঘ হইতেছে।

থামিলাম। অবসন্ন দেহ কথা বলিতে দেয় না।

ভিখারীরা খাওয়া শেষ করিয়া গোল হইয়া বসিল। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে তাহারা গান ধরিল। গানের অর্থ বুঝিলাম না, কেবল সুর শুনিতে লাগিলাম।

ভিখারীরা গাহিতে লাগিল। গাছের পাতায় পাতায় তাহাদের সুর গিয়া আঘাত করিল। সে সুর যেন প্রত্যেক চেতন অচেতন পদার্থকে বলিতে লাগিল যে এ জীবন সুন্দর। অনাহার, দারিদ্র, পীড়া—সব থাকা সত্ত্বেও এ জীবন সুন্দর। সে সুর বলিতে লাগিল—আকাশে সূর্য্য আর চন্দ্র আছে, পৃথিবীতে আছে ফুল আর ফল—হ্যাঁ, এই পৃথিবী সুন্দর। সে সুরের পথের বিচিত্র জীবনের অনুভূতি, মুক্ত জীবনের পদশব্দ আর অনাগত মুক্তির দিনের অনাড়ম্বর আনন্দের কথা প্রকাশ পাইল।

ভাবিতে থাকি। কবে সেদিন আসিবে?

হঠাৎ দমকা হাওয়া আরম্ভ হইল। কাল বৈশাখী আসিল। গাছের পাতা সশব্দে যেন বাতাশের সহিত ধ্রুপদ গাহিয়া উঠিল, যত সব শুষ্ক পত্রের দল বায়ুবেগে উড়িয়া চলিল। ঝড় উঠিল। সে দিন কিরূপ হইবে?

কালবৈশাখীর শোঁ শোঁ শব্দের মাঝে অকস্মাৎ এক বিরাট গগনবিদারী শব্দ যেন কাণে ভাসিয়া আসিল। চোখের সামনে পরমুহূর্ত্তেই

ফুটিয়া উঠিল একটি ছবি। সেই অনাগত বিপ্লবের দিনের ছবি দেখিলাম—অন্ধকার রাত্রির পৃথিবীতে দলে দলে কোটী কোটী নগ্নগাত্র মনুষ্য চলিয়াছে ভাস্করের পশ্চাতে পশ্চাতে। তাহাদের সকলের রুক্ষ কেশ-রাশি বায়ুভরে উড়িতেছে—চোখে জ্বলিতেছে বিদ্যুতজ্বালা। তাহাদের পদভরে মাটী যেন টলমল করিয়া কাঁপিতেছে।

হঠাৎ ভাস্কর বলিল "এবার তবে অভিযান আরম্ভ হোক্—ভাই সব, এখন থেকে এ পৃথিবী আমাদের সকলের।"

তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব নগ্নগাত্র বঞ্চিত মানুষের দল আরম্ভ করিল ধ্বংসলীলা—নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ও সুন্দর জীবন ফিরিয়া পাইবার জন্য। বড় বড় অট্টালিকা রেণু রেণু হইয়া আকাশকে মলিন করিল, ধর্ম্মমন্দির সব চূর্ণীকৃত হইল, দেবতার বিগ্রহ অপমানিত হইয়াও প্রাণ পাইল না—যাহা কিছু পুরাতন ও মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী ছিল—সব ধূলায় মিশিল। আর সেই ধূলাকে সিক্ত করিল উষ্ণ রক্তের স্রোত। অসংখ্য অমানুষের রক্তের মাঝে মানুষের মুক্তি আর মনুষ্যত্ব আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল।

বজ্রের মত হুঙ্কার করিয়া, সমস্ত আকাশ কম্পিত করিয়া ভাস্কর বলিল,"মায়া নেই, মমতা নেই—নির্ম্মমভাবে চূর্ণ কর সব—ভাই সব পৃথিবী এবার আমাদের।"

সকলে প্রতিধ্বনি তুলিল—"হ্যাঁ—পৃথিবী এবার সকলের—"

"আর মানুষের চেয়ে বড় কেউ নয়—বল মানুষের জয়—"

কোটী কণ্ঠের ঐক্যতান—"মানুষের জয়—মানুষের চেয়ে বড় কেউ নয়—"

ভাস্কর বলিল—"ভগবান! ভগবান নেই, ভগবান মৃত—বল ভাই মানুষই ভগবান—"

কিন্তু এবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। অন্ধকার আকাশটা হঠাৎ ফাটিয়া গেল আর তাহার মধ্য হইতে অগণিত নক্ষত্রের সিঁড়ি বাহিয়া এক বিরাট মূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল ভাস্করের সম্মুখে। চোখে তাহার কোটী স্থির বিদ্যুতের আলো, বিরাট দেহের প্রতি রোমকূপে অজ্ঞাত সৌর-জগতের সমাবেশ, বিরাট ও আয়ত চক্ষু দুইটি; যেন আকাশের মত অপরূপ আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘের মত কালো তাহার কেশরাশি, অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্যের মালা তাহার কণ্ঠদেশে।

ভাস্করের স্কন্ধে হাত রাখিয়া সেই মূর্ত্তি বলিল—"হে অতিমানব—আমি ত' মরি নাই—আমি মরিও না।"

ভাস্কর তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

মেঘমন্দ্রস্বরে উত্তর হইল—"আমি ভগবান।"

"কে তুমি—ভগবান!—হাঃ—হাঃ—হাঃ—" ভাস্কর হাসিয়া উঠিল।

কোটী কোটী লোকেরাও হাসিল—"ভগবান!—হাঃ হাঃ হাঃ—"

ভাস্কর আবার হাসিল—"তুমি ভগবান! হাঃ হাঃ হাঃ—"

সেই বিরাট মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ বলিল—"হ্যাঁ—আমি ভগবান—"

"কি দরকার তোমার? তোমায় ত' আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে আহ্বান করি নি—"

"না—তোমরা যে কর্ম্ম করেছ তার জন্য আমাকে আসতে হল।"

"কেন?"

"যারা পৃথিবীকে বদলায় আমি তাদের সাহায্য করি।"

"তুমিই যদি এই বিশ্বের স্রষ্টা তবে এতদিন সাহায্য করনি কেন?"

"করিনি—কারণ আমি মানুষের প্রার্থনায় আসি না। মানুষের কোনও অবস্থার জন্য আমি দায়ী নই। মানুষকে আমি সব দিয়েছি, আমারই মত তাদের শক্তিসম্পন্ন করেছি। তাদের সুখ দুঃখ তাদের

হাতে। তবু তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে—ছোট ছোট জিনিষ চায়—যা নিজেরাই চেষ্টা করলে লাভ করতে পারে। তারা মুর্খ। এই বিশ্বসংসারের বৈচিত্র বজায় রাখাই আমার কাম্য তাই আমি তাদের শক্তিতে যা সাধ্য তার জন্য প্রার্থনায় সাড়া দিই না। আমি প্রারম্ভ। আমি সকলের সৃষ্টি করি। আমি সমাপ্তি—কারণ ইন্দ্রিয়ের জগতের পরে—পৃথিবীতে সমস্ত আদর্শ, সমস্ত কাজ শেষ হলে আমাতেই ফিরে আসতে হবে। ইন্দ্রিয়ের জগৎ মানুষের হাতে। আমি ইন্দ্রিয়াতীত—তাই তাদের জগতের কোন কিছুই আমি দিতে পারি না—দিই না। আমি সাড়া দিই না—কিন্তু সাহায্য করি—যখন মানুষেরা আর পারে না. যখন সমস্ত কিছুকে তারা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়—এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীকে যখন তারা কুৎসিৎ করে তোলে—তখনই আমি আসি আর অতিমানবের রথের সারথি হই—অতএব—"

"অতএব?"—ভাস্কর হাসিল। সে ভগবানকে বিশ্বাস কবিল। ভগবানের মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরে মিথ্যার লেশ নাই। তবু সে মাথা নীচু কবিবে না, ভগবান যখন সত্যই আছে—তখন মানুষের দেবত্ব ত আরও সুপ্রমাণিত হইল। কারণ মানুষ ঐ বিরাট আলোকমুর্ত্তিরই ভগ্নাবশেষ।

"অতএব—আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই, করব?"

ভাস্কর মাথা নাড়িল—"কর।"

একটি মশাল তুলিয়া লইয়া ভগবান বলিল—"চল—আমি তোমাদের অন্ধকার পথকে আলোকিত করি—"

ভাস্করের মুখে ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র হাসি। আশ্চর্য্য এই ভগবান।

চলিতে চলিতে ভগবান বলিল—"হে অতিমানব, তুমি আমার অন্তরতম, কারণ পৃথিবীর অন্যায়কে দূর করার কাজ আমার হয়ে তুমিই করেছ—তুমি আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।"

সমগ্র পৃথিবীর লোকেরা ভগবানের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ভাস্কর বলিল—"ভাই সব, মৃত ভগবান পুনর্জ্জীবিত হয়েছে, কিন্তু মনে রেখো—আমাদের পৃথিবীর জন্য আমরাই দায়ী—ভগবান নয়।"

ভগবান সেই রুধিরস্নাত মানবসমুদ্রের দিকে চাহিয়া বলিল—"গাও সব—তোমাদের নবীন জীবনের গান।"

সকলে গাহিল—"মানুষের জয়—"। নূতন পৃথিবীর নূতন মানুষেরা তাহাই গাহিবে। ঈশ্বরের বিষয়ে তাহারা গাহিবে না। কারণ তাহারা তখন জানিবে যে মানুষই ঈশ্বরের ভগ্নাবশেষ। চোখের সামনে ছবিটা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি। ভগবানের হস্ত ধরিয়া চলিয়াছে ভাস্কর। ভগবানের হস্তস্থিত মশালের আলো অন্ধকারের বক্ষে আগুন জ্বালাইতেছে। তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে বহ্নি। রক্তারুণ সূর্য্যতনয়ার মত জ্বলন্ত শ্রীসম্পন্না বহ্নি। তাহার পশ্চাতে কোটী কোটী মুক্ত নরনারী, ধ্বংসস্তূপ আর অমানুষদের অসুন্দর রক্ত-পঙ্ক।

কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় সারা অরণ্যের মর্ম্মকোষে ঘা দিতেছে, যেন অদৃশ্য হস্তে কোনও বাদ্যকর পাখোয়াজ বাজাইতেছে। বাতাসের শব্দে যেন কোটী লোকের সঙ্গীত। রাত্রি গভীর হইতেছে—হোক্— আর ভয় নাই। ভগবান আছে।

দেহে হঠাৎ অসীম বল পাই। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলাম—উগ্র আনন্দে। আমার অতিমানব ভগবানকে মাটীতে টানিয়া আনিবে—হ্যাঁ, ভগবান আছে।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই হঠাৎ দেবীর কথা মনে পড়ে, তাহার মুখটা যেন দেখিতে পাই আর একটা যন্ত্রণাদায়ক বেদনা আমার হৃদয়ে

চাপিয়া বসে। 'তোমারে ভুলিনি প্রিয় যদিও নেমেছি হায় পথের ধূলায়—'

দুই জগতের মানুষ আমি। তাই আনন্দে ও বেদনায় মিশ্রিত হইয়া আমার হাসি হইয়া উঠিল অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক।

অনেকক্ষণ হাসিলাম। বাতাসের হাহা শব্দের সহিত কতকক্ষণ যে আমার হাসি মিশাইয়া দিলাম বুঝিতে পারি না।

যখন হাসি থামিল তখন দেখিলাম যে পাগল ভিখারীটা আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছে।

হাসিয়া সে আমায় বলিল—"কিরে শালা, তুইও পাগ্‌লা বুঝি? হা-হা-হা—"

চোখের সামনে আবার অন্ধকার কেন? এই কি মৃত্যু? হোক্—আর ক্ষতি নাই। আমার স্বপ্ন সার্থক হইবেই। দেবী আঃ—কি অন্ধকার।

কাল বৈশাখীর হুহুঙ্কার সমানে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে অদৃশ্য যোদ্ধাদের অস্ত্রের ঝনৎকার, পতনোন্মুখ অট্টালিকার শব্দ, অসংখ্য অমানুষের মরণ চীৎকার। তাঁহার মধ্যে মানব জাতির দুরন্ত আত্মার গর্জ্জন—যে আত্মা দুর্ভিক্ষেও মরে না, নগ্নতায় লজ্জিত হয় না, সহস্র দুঃখেও বিষণ্ণ হয় না; যে আত্মা মানুষকে অবিচার, উৎপীড়ন আর অত্যাচারের মধ্য দিয়া এক নবীন জগতের দিকে, সাম্যের জগতের দিকে লইয়া যাইতেছে। কাল-বৈশাখীর হুহুঙ্কার। তাহার মধ্যে অনাগত পৃথিবীর উৎসবের কোলাহল। সহস্র সহস্র নিষ্পাপ তরুণ-তরুণীর নৃত্যগীতের ললিতরাগ। কালবৈশাখী। ধূলা উড়িতেছে, পাতা উড়িতেছে, ঝরিতেছে, নিরন্ধ্র অন্ধকার আবর্ত্তিত ও বিক্ষুব্ধ হইতেছে। উড়ুক—ঝরুক—ভয় নাই। হে কালবৈশাখী আরও উন্মত্ত হোক তোমার অভিযান—

"দুব কর মোহ আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তেব কালো মায়াজাল
হাস্থক শ্যামল কিশলয়।—"

আমাদের চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে—কেন? দেবী। এই কি মৃত্যু?—

*   *   *

যোগেশদা'র ডায়েরী হইতে—

১০ই বৈশাখ

ভারী আশ্চর্য্য খবর এখন পাইলাম। ইঞ্জিনীয়ার অনিল মিত্রের বিবাহ স্থগিত হইয়াছে। কারণটা আরও বিস্ময়কর। পাত্রী নিখোঁজ। মেয়েটির নাম দেবী। ব্যাপারটা কি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। মস্তিষ্ক তাহার সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, পাত্রও সুদর্শন. ধনী পরস্পরের মধ্যে তাহাদেব ভালবাসাও ছিল;—তবুও কেন দেবী গৃহত্যাগ করিয়াছে?

১৫ই বৈশাখ

আজ যে সংবাদ পাইলাম তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি। চাপা দুঃখে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। নবেন্দুকে একটি জঙ্গলে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কয়েক-দিন আগে তাহার বাড়ী গিয়াছিলাম—দেখিলাম শূন্য বাড়ী—জানালা দরজাগুলি খোলা। পাশের বাড়ীর ভদ্র লোকদের বড় চিন্তিত দেখিলাম। সেই বাড়ীর একটি মেয়ে ভাবী কাঁদিতেছিল। সে কি তাহাকে ভালবাসিত?

আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাহিত্যিকেরা একটু অভিনব হয় বটে, কিন্তু নবেন্দু ছিল আরও বিচিত্র ধরণের—একেবারে পাগল। তবুও মাঝে মাঝে তাহার কথাগুলি ভারী ভালো লাগিত—একটা অন্য জগতের আভাষ পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতাম।

তাহার সঙ্গে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। বিচিত্র নায়ক-নায়িকা সম্বলিত এক অসমাপ্ত ও নাটকীয় কাহিনী। সে কাহিনী এই পৃথিবীতে সম্ভব নয়। সে তাহার কল্পলোকের কাহিনী।

মর্গের ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছি যে তাহার শীর্ণ মুখে এক অপূর্ব্ব হাসি জমাট হইয়াছিল। বোধ হয় তাহার কল্পলোকের স্বপ্ন। তাহার স্বপ্ন সার্থক হইবে কি? আমার মনে হয় হইবে। বহু যুগ, শতাব্দী, সহস্র, লক্ষ বৎসর লাগিলেও তাহার স্বপ্ন একদিন নিশ্চয়ই সার্থক হইবে।

কারণ সে শিল্পীদের—স্বপ্নদর্শী মানুষদেরই একজন। তাহাদের স্বপ্ন আমাদের পৃথিবীকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তোলে। তাহাদের স্বপ্ন অগ্নির মত। একদিন তাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে—সমগ্র মানবজাতির আত্মাকে তাহা ভাস্বর করিয়া তুলিবে।

পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীদের উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম জানাইতেছি।